Syllabus For BCS (Written) Examination

GENERAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (COMPULSORY)

Subject Code: 010

Part – A: General Science

Marks - 60

S.L	Chapter
i	Light: Nature, Spectrum, Different colours and wavelengths, UV, IR, and LASER, Reflection of Light, Refraction of Light, Total Internal Reflection of Light, Lenses, Thin converging lens, Dispersion of light, particle nature of light, Einstein's photoelectric equation, photocells
ii	Sound: Hearing mechanism, Decibel, Frequency, Sound machines in home and around, Microphone, Loud speaker, Public address system, Characteristics of a sound note, Formation of stationary waves in stretched string, Laws of vibrating strings, Beats, Doppler Effect, Applications and limitations of Doppler Effect, Echoes, Absorption of sound wave, Reverberations, Fundamentals of Building acoustics, Statement of Sabine's formula
iii	Magnetism: Polarity and relationship with current, Bar magnet, Magnetic lines of force, Torque on a bar magnet in a magnetic field, Earth's magnetic field as a bar magnet, Tangent galvanometer, Vibration magnetometer, Para, dia and ferromagnetic substances with examples, Electromagnets and permanent magnets
iv	Acid, Base and Salt: Acid-base concepts; characteristics of acids and bases; acid-base indicators; uses of acids and bases in daily life and caution in handling them; social effects of misuse of acids; reason for acidity in stomach and selection of the right food; pH; measurement and importance of pH of substances; salts; characteristics of salts; necessity of salt in daily life; uses of salts in agriculture and industries
v	Water: Properties of water; melting and boiling points of water; electrical conductivity; structure of water; hydrogen bonding; sources of water; sources of fresh water in Bangladesh; water quality parameters (colour and taste; turbidity; presence of radioactive substances; presence of waste; dissolved oxygen; temperature; pH and salinity); recycling of water; role of water in conservation of nature; necessity of quality water; purification of water (filtration; chlorination; boiling and distillation); reasons for pollution of water sources in Bangladesh; effects of water pollution on plants, animals and human beings; effects of global warming on fresh water; strategy for preventing water pollution and responsibility of citizens or public awareness; prevention of water pollution by industries; prevention of water pollution due to soil erosion from agricultural land; conservation of water sources and development
vi	Our resources: Soil; types of soil; soil pH; reasons and effects of soil pollution; natural gas and its main compositions; processing, uses and sources of natural gas, petroleum and coal; forestry; limitations and conservation of our resources
vii	Polymer: Natural and synthetic polymer; polymerization process; sources, characteristics and usage of natural and synthetic polymers; manufacturing process, characteristics and uses of fibers, silk, wool, nylon and rayon; physical and chemical properties of rubber and plastic; role of rubber and plastic for environmental imbalance; aware of using rubber and plastic
viii	Atmosphere: Biosphere and Hydrosphere, Ionosphere, role of oxygen, carbon dioxide and nitrogen. Potable and polluted water, Pasteurization.
ix	Food and Nutrition: Elements of food; carbohydrates; protein; fats and lipid; vitamins; types and sources of carbohydrates, proteins; nutritional value; menu of balanced diet; the pyramid of balanced diet; body mass index (BMI); fast food or junk food; preservation of food; various processes of storing food; use of chemicals for preservation of foods and its physiological effects
x	Biotechnology: Chromosome; shape, structure and chemical composition of chromosome; nucleic acid; deoxyribonucleic acid (DNA); ribonucleic acid (RNA); protein; gene; DNA test; forensic test; genetic disorder in human beings; Biotechnology and Genetic Engineering; cloning; social effects of cloning; transgenic plants and animals; Use of biotechnology in agricultural, milk products and pharmaceutics; Gene therapy; Genetically modified organism; Nanotechnology; Pharmacology; Pharmacokinetics
xi	Disease and Healthcare: Deficiency, Infection, Antiseptic, Antibiotics, Stroke, Heart Attack, Blood Pressure, Hypertension and Diabetes, Dengue; Diarrhoea; Drug addiction, Vaccination, Cataract, food poisoning, X-ray; Ultrasonography; CT Scan; MRI; ECG; Endoscopy; Radiotherapy; Chemotherapy; Angiography; uses, risk and side-effects of above techniques; Basic concept of Cancer, AIDS and Hepatitis

সূচিপত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	অধ্যায় ০১ : আলো (Light)	
০১	আলোর প্রকৃতি (Nature of Light)	০৩
০২	তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালি, বিভিন্ন বর্ণ ও এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Electro-Magnetic Spectrum, Different Colours and Wavelengths)	০৫
০৩	অতিবেগুনি রশ্মি, অবলোহিত রশ্মি ও লেজার (UV, IR & LASER)	০৭
০৪	আলোর প্রতিফলন (Reflection of Light)	০৮
০৫	পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (Total Internal Reflection of Light)	১০
০৬	আলোর প্রতিসরণ (Refraction of Light)	১১
০৭	লেন্স (Lens)	১২
০৮	আলোর বিচ্ছুরণ (Dispersion of Light)	১৫
০৯	আলোর কণা ধর্ম এবং আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ (Particle Nature of Light & Einstein's Photo Electric Equation)	১৭
১০	ফটোসেল (Photocells)	১৯
১১	বিবিধ (Miscellaneous)	২০
১২	নমুনা লিখিত প্রশ্ন	২০
১৩	নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর	২১
	অধ্যায় ০২ : শব্দ (Sound)	
১৪	শোনার প্রক্রিয়া,ডেসিবেল, কম্পাঙ্ক (Hearing Mechanism, Decibel, Frequency)	২৩
১৫	শব্দ যন্ত্র, মাইক্রোফোন, লাউড স্পীকার এবং পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম (Sound Machines in Home & Around, Microphone, Loud Speaker & Public Address System)	২৭
১৬	শব্দ স্বরের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a sound note)	২৮
১৭	স্থির তরঙ্গ, টানা তারের আড় কম্পনের সূত্রাবলি (Formation of Stationary Waves in Stretched String, Laws of Vibrating Strings)	২৯
১৮	বীট (Beats)	৩২
১৯	ডপলার ক্রিয়া (Doppler Effect, Applications & Limitations of Doppler Effect)	৩৩
২০	প্রতিধ্বনি (Echoes)	৩৪
২১	শব্দ তরঙ্গের শোষণ, অনুরণন ও শব্দবিজ্ঞান গঠনের মূলনীতি (Absorption of Sound Wave, Reverberations & Fundamentals of Building Acoustics)	৩৫
২২	সেবাইনের সূত্রটি (Statement of sabine's Formula)	৩৬
২৩	নমুনা লিখিত প্রশ্ন	৩৬
২৪	নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর	৩৬
	অধ্যায় ০৩ : চুম্বকত্ব (Magnetism)	
২৫	চুম্বক ও চৌম্বকত্ব (Magnet and Magnetism)	৩৮
২৬	চুম্বকত্ব : পোলারিটি ও বিদ্যুতের সাথে সম্পর্ক (Magnetism : Polarity and Relationship with Current)	৪১
২৭	দণ্ড চুম্বক (Bar Magnet)	৪২
২৮	চৌম্বক বলরেখা (Magnetic lines of force)	৪২
২৯	চৌম্বকক্ষেত্রে একটি দণ্ড চৌম্বকের টর্ক (Torque on a bar magnet in a magnetic field)	৪৩
৩০	দণ্ড চৌম্বক হিসাবে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র (Earth's magnetic field as a bar magnet)	৪৪
৩১	চলচুম্বক গ্যালভানোমিটার (Tangent Galvanometer)	৪৬
৩২	কম্পন ম্যাগনেটোমিটার (Vibration Magnetometer)	৪৬
৩৩	উদাহরণসহ প্যারা, ডায়া এবং ফেরোচুম্বক পদার্থ (Para, Dia and Ferromagnetic Substances with examples)	৪৭
৩৪	তড়িৎ চৌম্বক এবং স্থায়ী চৌম্বক (Electromagnets and Permanent Magnets)	৪৯
৩৫	নমুনা লিখিত প্রশ্ন	৫০
৩৬	নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর	৫১

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	অধ্যায় ০৪ : অম্ল, ক্ষারক ও লবণ (Acid, Base & Salt)	
৩৭	অম্ল ও ক্ষারের ধারণা (Acid - Base concepts)	৫৩
৩৮	অম্ল ও ক্ষারের বৈশিষ্ট্য, দৈনন্দিন জীবনে এর ব্যবহার ও সতর্কতা (Characteristics of Acids and Bases, Uses of Acids & Bases in Daily Life & Caution in handling them)	৫৫
৩৯	এসিডের অপব্যবহার (Social Effects of Misuse of Acids)	৫৭
৪০	pH পরিমাপ ও এর গুরুত্ব (pH, measurement and importance of pH of substances)	৫৭
৪১	অম্ল-ক্ষারক নির্দেশক (Acid-base indicators)	৫৯
৪২	পাকস্থলীতে এসিডিটির কারণ ও সঠিক খাদ্য নির্বাচন (Reason for acidity in stomach and selection of the right food)	৬০
৪৩	লবণ ও এর বৈশিষ্ট্য (Salts, characteristics of salts)	৬১
৪৪	দৈনন্দিন জীবনে লবণের প্রয়োজনীয়তা, কৃষি ও শিল্পে লবণের ব্যবহার (Necessity of salt in daily life, Uses of salts in agriculture and industries)	৬২
৪৫	বিবিধ (Miscellaneous)	৬৩
৪৬	নমুনা লিখিত প্রশ্ন	৬৬
৪৭	নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর	৬৭
	অধ্যায় ০৫ : পানি (Water)	
৪৮	পানির বৈশিষ্ট্য, পানির গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক, তড়িৎ পরিবাহিতা, পানির গঠন, হাইড্রোজেন বন্ধন (Properties of Water; Melting and Boiling Points of Water, Electrical Conductivity; Structure of Water; Hydrogen Bonding)	৭০
৪৯	পানির উৎস, বাংলাদেশে মিঠা পানির উৎস (Sources of water, sources of fresh water in Bangladesh)	৭১
৫০	পানির মানদণ্ড (বর্ণ ও স্বাদ, ঘোলাটে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতি, ময়লা আবর্জনার উপস্থিতি, তাপমাত্রা, pH এবং লবণাক্ততা, দ্রবীভূত অক্সিজেন (Water quality parameters, colour & taste, turbidity, presence of radioactive substances, presence of waste, temperature, pH & salinity, dissolved oxygen)	৭৩
৫১	বাংলাদেশে পানির উৎস দূষণের কারণ; উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের উপর পানি দূষণের প্রভাব; মিঠা পানির উপর বৈশ্বিক প্রভাব (Reasons for pollution of water sources in Bangladesh; Effects of water pollution on plants, animals and human beings; Effects of Global Warming on Fresh Water)	৭৬
৫২	শিল্প কারখানার দ্বারা পানি দূষণ প্রতিরোধ, কৃষি জমি থেকে মাটির ক্ষয়জনিত কারণে পানি দূষণ প্রতিরোধ; পানি দূষণ প্রতিরোধের কৌশল এবং নাগরিকের দায়িত্ব এবং জনসচেতনতা (Prevention of Water Pollution by Industries; Prevention of water pollution due to soil erosion from agricultural land; Strategy for perventing water pollution and responsibility of citizens or public awareness)	৭৭
৫৩	পানি চক্র, পরিবেশ সংরক্ষণে পানির ভূমিকা (Recycling of water, Role of water in conservation of nature)	৭৮
৫৪	পানির বিশুদ্ধকরণ (পরিস্রাবণ, ক্লোরিনেশন, স্ফুটন ও পাতন); পানির উৎস সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (Purification of water (filtration, chlorination, boiling and distillation); Conservation of water sources and development)	৭৯

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৫৫	বিবিধ (Miscellaneous)	৮১
৫৬	নমুনা লিখিত প্রশ্ন	৮২
৫৭	নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর	৮৩
	অধ্যায় ০৬ : আমাদের সম্পদ (Our Resources)	
৫৮	মাটি: মাটির প্রকারভেদ, মাটির pH, মাটি দূষণের কারণ ও প্রভাব (Soil: types of soil, Soil pH, Reasons and effects of soil pollution)	৮৭
৫৯	প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তার প্রধান উপাদানসমূহ, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম ও কয়লার উৎস, প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবহার (Natural gas and its main compositions, Processing, uses and sources of natural gas, petroleum and coal)	৯০
৬০	বনপালনবিদ্যা,আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও সংরক্ষণ (Forestry; Limitations and conservation of our resources)	৯৬
৬১	বিবিধ (Miscellaneous)	৯৮
৬২	নমুনা লিখিত প্রশ্ন	৯৯
৬৩	নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর	৯৯
	অধ্যায় ০৭ : পলিমার (Polymer)	
৬৪	প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পলিমার,পলিমারকরণ প্রক্রিয়া; প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পলিমারের উৎস, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার (Natural and synthetic polymer; Polymerization process; Sources, characteristics and usage of natural and synthetic polymers)	১০২
৬৫	তন্তু, সিল্ক, পশম, নাইলন ও রেয়নের প্রস্তুত প্রণালি, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার (Manufacturing process, characteristics and uses of fibers, silk. Wool, nylon and rayon)	১০৬
৬৬	রাবার ও প্লাস্টিকের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম; পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় রাবার ও প্লাস্টিক; রাবার ও প্লাস্টিক ব্যবহারে সাবধানতা (Physical and chemical properties of rubber and plastic; Role of rubber and for environment imbalance; Aware of using rubber and plastic)	১০৯
৬৭	নমুনা লিখিত প্রশ্ন	১১১
৬৮	নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর	১১১
	অধ্যায় ০৮ : বায়ুমণ্ডল (Atmosphere)	
৬৯	জীবমণ্ডল ও বারিমণ্ডল (Biosphere and Hydrosphere)	১১৫
৭০	অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেনের ভূমিকা (Role of Oxygen, Carbon Dioxide and Nitrogen)	১২২
৭১	মিঠা ও দূষিত পানি (Potable and Polluted Water)	১২৪
৭২	পাস্তুরায়ন (Pasteurization)	১২৫
৭৩	বিবিধ (Miscellaneous)	১২৬
৭৪	নমুনা লিখিত প্রশ্ন	১২৬
৭৫	নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর	১২৭
	অধ্যায় ০৯: খাদ্য ও পুষ্টি (Food & Nutrition)	
৭৬	খাদ্য উপাদান এবং পুষ্টিমান (Elements of Food & Nutritional Value)	১৩০
৭৭	শর্করা (Carbohydrates)	১৩১
৭৮	আমিষ (Protein)	১৩২
৭৯	চর্বি এবং স্নেহ পদার্থ (Fats & Lipid)	১৩৩
৮০	ভিটামিন (Vitamins)	১৩৬
৮১	সুষম খাদ্যের তালিকা (Menu of Balanced Diet)	১৩৯
৮২	সুষম খাদ্যের পিরামিড (Pyramid of Balanced Diet)	১৪০
৮৩	দেহের ভর সূচি (Body Mass Index)	১৪১

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৮৪	ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড (Fast Food or Junk Food)	১৪২
৮৫	খাদ্য সংরক্ষণ (Preservation of Food)	১৪২
৮৬	বিবিধ (Miscellaneous)	১৪৪
৮৭	নমুনা লিখিত প্রশ্ন	১৪৬
৮৮	নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর	১৪৭
	অধ্যায় ১০: জৈব প্রযুক্তি (Biotechnology)	
৮৯	ক্রোমোজোম; আকৃতি, গঠন এবং রাসায়নিক গঠন (Chromosome: Shape, Structure and Chemical Composition of Chromosome)	১৫১
৯০	নিউক্লিক এসিড, ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (ডিএনএ), রাইবোনিউক্লিক এসিড (আরএনএ) (Nucleic Acid, Deoxyribonucleic Acid (DNA) & Ribonucleic Acid (RNA)	১৫৪
৯১	প্রোটিন এবং জিন (Protein & Gene)	১৫৭
৯২	মানুষের জেনেটিক বিশৃঙ্খলা (Genetic Disorder in Human Beings)	১৫৮
৯৩	জৈবপ্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Biotechnology and Genetic Engineering)	১৫৯
৯৪	ক্লোনিং ও ক্লোনিংয়ের সামাজিক প্রভাব (Cloning & Social Effects of Cloning)	১৬১
৯৫	ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণী (Transgenic Plants and Animals)	১৬২
৯৬	কৃষি, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন ও ঔষধ শিল্পে জৈব বৈচিত্র্যের ব্যবহার (Use of Biotechnology in Agricultural, Milk Products & Pharmaceutics)	১৬২
৯৭	ডিএনএ টেস্ট এবং ফরেনসিক টেস্ট (DNA Test & Forensic Test)	১৬৪
৯৮	জিন থেরাপি (Gene Therapy)	১৬৫
৯৯	জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত অর্গানিজম (Genetically Modified Organism)	১৬৫
১০০	ন্যানো টেকনোলজি, ফার্মাকোলজি এবং ফার্মাকোকাইনিটিকস (Nanotechnology, Pharmacology & Pharmacokinetics)	১৬৬
১০১	বিবিধ (Miscellaneous)	১৬৮
১০২	নমুনা লিখিত প্রশ্ন	১৬৯
১০৩	নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর	১৭০
	অধ্যায় ১১ : রোগ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা (Disease & Healthcare)	
১০৪	অভাবজনিত রোগ (Deficiency)	১৭৪
১০৫	সংক্রমণ (Infection)	১৭৫
১০৬	জীবাণু প্রতিরোধক এবং জীবাণুনাশক (Antiseptic & Antibiotics)	১৭৭
১০৭	স্ট্রোক, হার্ট এটাক এবং রক্তচাপ (Stroke, Heart Attack & Blood Pressure)	১৭৮
১০৮	উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস (Hypertension & Diabetes)	১৮৪
১০৯	ডেঙ্গু, ডায়রিয়া এবং মাদকাসক্তি (Dengue, Diarrhoea & Drug Addiction)	১৮৬
১১০	চোখের ছানি এবং খাদ্য বিষক্রিয়া (Cataract & Food Poisoning)	১৮৯
১১১	এক্সরে, আল্ট্রাসনোগ্রাফি, (X-ray, Ultrasonography)	১৯০
১১২	সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই (CT Scan & MRI)	১৯২
১১৩	এন্ডোস্কোপি এবং ইসিজি (Endoscopy & ECG)	১৯৪
১১৪	রেডিও থেরাপি, কেমোথেরাপি এবং এনজিওগ্রাফি (Radiotherapy, Chemotherapy & Angiography)	১৯৫
১১৫	ক্যান্সার, এইডস এবং হেপাটাইটিসের প্রাথমিক ধারণা (Basic concept of Cancer, AIDS & Hepatitis)	১৯৭
১১৬	ভ্যাক্সিন (Vaccination)	২০০
১১৭	বিবিধ (Miscellaneous)	২০১
১১৮	নমুনা লিখিত প্রশ্ন	২০৩
১১৯	নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর	২০৪

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

Part A : General Science

ক্র.নং	অধ্যায়ের নাম	৪৭তম	৪৬তম	৪৫তম	৪৪তম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম	মোট
০১	আলো	২	–	৩	৪	৩	১	৩	৩	৩	–	৪	২৬
০২	শব্দ	–	১	২	১	৩	৩	–	৫	১	–	–	১৬
০৩	চুম্বকত্ব	১	৩	২	৪	–	–	১	১	২	১	–	১৫
০৪	অম্ল, ক্ষারক ও লবণ	২	১	৪	৫	৩	২	৪	১	৫	৫	৩	৩৫
০৫	পানি	২	২	৪	১	৩	২	–	১	৩	২	৬	২৬
০৬	আমাদের সম্পদ	২	৩	১	৭	১	৩	৩	৩	২	৮	২	৩৫
০৭	পলিমার	২	২	৩	১	১	–	২	১	১	–	–	১৩
০৮	বায়ুমণ্ডল	১	৬	২	৩	৩	১	৩	–	১	–	২	২২
০৯	খাদ্য ও পুষ্টি	২	২	৩	১	৪	৫	৪	৫	৭	৫	৪	৪২
১০	জৈব প্রযুক্তি	২	২	৩	২	১	৩	১	৪	৪	২	৮	৩২
১১	রোগ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা	২	৩	–	২	৫	৪	৭	৩	১	৫	৩	৩৫
মোট		১৮	২৫	২৭	৩১	২৭	২৪	২৮	২৭	৩০	২৮	৩২	২৯৭

অধ্যায় ০১

আলো
(Light)

Syllabus : Nature, Spectrum, Different Colours and Wavelengths, UV, IR, and LASER, Reflection of Light, Refraction of Light, Total Internal Reflection of Light, Lenses, Thin Converging Lens, Dispersion of Light, Particle Nature of Light, Einstein's Photoelectric Equation, Photocells.

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০১. কোন কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে LASER আলো সাধারণ আলো হতে আলাদা? [৪৭তম বিসিএস]
০২. Fibre Optic Communication- এর ক্ষেত্রে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এর গুরুত্ব কী? [৪৭তম বিসিএস]
০৩. আলোর প্রতিফলন কত প্রকার ও কী কী? ব্যাখ্যা করুন। [৪৫তম বিসিএস]
০৪. LASER কী? এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস]
০৫. তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার লিখুন। [৪৫তম বিসিএস]
০৬. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সংজ্ঞা দিন। মরীচিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]
০৭. কোনো যন্ত্র ছাড়া কীভাবে লেন্স শনাক্ত করা যাবে? [৪৪তম বিসিএস]
০৮. বিপদ সংকেতে লাল রঙ ব্যবহার করা হয় কেন? [৪৪তম বিসিএস]
০৯. কৃষ্ণ গহ্বর কী? [৪৪তম বিসিএস]
১০. আলো কী? আলোর তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব আলোচনা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
১১. শক্তি ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্রমানুসারে বিভিন্ন তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের নাম লিখুন। [৪৩তম বিসিএস]
১২. বর্ণান্ধতা কী? ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
১৩. আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে? আলোর প্রতিসরণের নিয়মগুলো লিখুন। [৪১তম বিসিএস]
১৪. অতিবেগুনি রশ্মি কী? এটা কী কী কাজে ব্যবহৃত হয়? [৪০তম বিসিএস]
১৫. প্রভা কী? প্রভা কত প্রকার ও কী কী? চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রভার ব্যবহার বর্ণনা করুন। [৪০তম বিসিএস]
১৬. সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য লাল দেখায় কেন? [৪০তম, ২০তম বিসিএস]
১৭. আলোর বিচ্ছুরণ কী? বর্ণালি সম্বন্ধে আলোকপাত করুন। [৩৮তম বিসিএস]
১৮. পানিতে পুঁতে রাখা বাঁশের খুঁটির ছায়া পানিতে বাঁকা দেখায় কেনো? [৩৮তম বিসিএস]
১৯. সৌরশক্তির বর্তমান ব্যবহার এবং এর সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। [৩৮তম বিসিএস]
২০. আলোর উপাদান কী? সূর্য হতে পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত আলোক তরঙ্গ সমূহের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উল্লেখপূর্বক শ্রেণীবিন্যাস করুন। [৩৭তম বিসিএস]
২১. সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানবদেহের কি কি ক্ষতি হয়? [৩৭তম বিসিএস]
২২. সূর্যরশ্মি হতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে দুইটি পদ্ধতির বর্ণনা দিন। [৩৭তম বিসিএস]
২৩. সাদা আলোক বিশ্লিষ্ট করলে কয়টি বর্ণ পাওয়া যায়? বর্ণগুলো কী কী? [৩৫তম বিসিএস]
২৪. সড়কে বিপদ সংকেতে সবসময় লাল আলো ব্যবহার করা হয় কেন? [৩৫তম বিসিএস]
২৫. সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় দিগন্ত রেখায় আকাশের রং লাল হয় কেন? [৩৫তম বিসিএস]
২৬. আলোকের ধর্মের বিবরণ দিন। [৩৫তম বিসিএস]
২৭. RUBY LASER এর গঠন বর্ণনা করুন। [৩৪তম বিসিএস]
২৮. হীরকের সংকট কোণ ২৪° বলতে কী বুঝায়? [৩৪তম বিসিএস]
২৯. গামা রশ্মি কী? এর প্রভাবে মানুষের কী কী ক্ষতি হতে পারে? [৩৪তম বিসিএস]
৩০. লেজার (LASER) কী? এর প্রয়োগ আলোচনা করুন। [৩৩তম, ২৭তম বিসিএস]
৩১. VIBGYOR কী? আকাশ নীল দেখায় কেন? [৩৩তম, ২৩তম, ১০তম বিসিএস]
৩২. X-ray কী? চিকিৎসা বিজ্ঞানে X-ray এর গুরুত্ব কী? [৩৩তম, ২৯তম, ২১তম বিসিএস]

৩৩. রঙিন টিভিতে কোন কোন আলোক রশ্মি ব্যবহার করা হয়? এসব রশ্মি কীভাবে সৃষ্টি করা যায়?	[৩৩তম বিসিএস]
৩৪. আলোর বিচ্ছুরণ ও বর্ণালি ব্যাখ্যা করুন। সৌর বর্ণালি কী?	[৩১তম বিসিএস]
৩৫. মৌলিক রংগুলো কী কী? কোনো বস্তুর রং কালো দেখায় কেন?	[৩০তম বিসিএস]
৩৬. সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি ও গামা রশ্মির প্রভাবে কী কী ক্ষতি হতে পারে?	[৩০তম বিসিএস]
৩৭. অবলোহিত রশ্মি কী? এটি কী কী কাজে ব্যবহৃত হয়?	[২৯তম বিসিএস]
৩৮. UV ও IR কী আলো? এদের ব্যবহার কী? এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত এবং এদের মধ্যে কার শক্তি বেশি?	[২৭তম বিসিএস]
৩৯. গাছের পাতা সবুজ দেখা যায় কেন?	[২৭তম বিসিএস]
৪০. সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্ব ও টিউবলাইটের আলোর উৎপত্তিগত পার্থক্য কী?	[২৪তম, ১৮তম বিসিএস]
৪১. লেজার (LASER) রশ্মির বৈশিষ্ট্য কী কী?	[২৩তম বিসিএস]
৪২. মহাজাগতিক রশ্মি কী?	[২২তম বিসিএস]
৪৩. LASER কী? ইহার ব্যবহার আলোচনা করুন।	[২২তম, ২০তম, ১৭তম, ১১তম বিসিএস]
৪৪. এক্স-রে ও গামা-রে-এর মধ্যে তফাৎ কী?	[২২তম বিসিএস]
৪৫. চাঁদের হলদে আলোতে লাল গোলাপ কেমন দেখাবে?	[২১তম বিসিএস]
৪৬. কোনো বস্তু কীভাবে দেখা যায়? বিভিন্ন বস্তুর রং ভিন্ন কেন?	[১৮তম বিসিএস]
৪৭. কোনো তেজস্ক্রীয় মৌল হতে কী কী কণা এবং রশ্মি নির্গত হয়?	[১৮তম বিসিএস]
৪৮. হলোগ্রাম কাকে বলে?	[১১তম বিসিএস]

Nature of Light

আলো

[প্রশ্ন: আলো কী? (৪৩তম)]

আলো এক প্রকার শক্তি যা দর্শনানুভূতি জাগায়। আলো এক ধরনের বিকীর্ণ শক্তি যা তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ আকারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মাধ্যম ছাড়াও চলাচল করতে পারে। মাধ্যম ভেদে আলোর বেগ পরিবর্তন হয়ে থাকে। শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ সবচেয়ে বেশি, তবে তা অসীম নয়। শূন্যস্থানে আলোর বেগ প্রতি সেকেন্ডে ২৯,৯৭,৯২,৪৫৪ মিটার বা ৩×১০^{৮} মিটার বা ১,৮৬,০০০ মাইল। দৃশ্যমান আলো মূলত তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালির ছোট একটি অংশ মাত্র।

আলোকের ধর্ম

[প্রশ্ন: আলোকের ধর্মের বিবরণ দিন। (৩৫তম)]

১. কোনো স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো সরলপথে চলে।
২. কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যমে আলো একটি নির্দিষ্ট বেগে চলে। শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ $3 \times 10^8 \mathrm{ms}^{-1}$.
৩. আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন, বিচ্ছুরণ এবং সমবর্তন ঘটে।
৪. আলো এক প্রকার শক্তি।
৫. আলো এক ধরনের তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ।
৬. আলো কখনও তরঙ্গধর্মী আবার কখনও কণাধর্মী।

উদাহরণ: পৃথিবীর কক্ষপথের সূর্য থেকে দূরত্ব ৮.১৯ আলোক-মিনিট। অথবা $\frac{৮.১৯}{৬০ \times ২৪ \times ৩৬৫}$ আলোকবর্ষ।

আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে যে-সব তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলি হলো-

ক. আলোর কণা তত্ত্ব (Corpuscular Theory)
খ. আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব (Wave Theory)
গ. আলোর তাড়িতচৌম্বক তত্ত্ব (Electromagnetic Theory)
ঘ. আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব (Quantum Theory)

দীপ্তমান বস্তু থেকে আলো কীভাবে আমাদের চোখে আসে তা উপর্যুক্ত তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা থেকে জানা যায়।

ক. আলোর কণা তত্ত্ব

স্যার আইজ্যাক নিউটন ১৬৭২ সালে আলোর এ তত্ত্বটি প্রদান করেন। এ তত্ত্ব অনুসারে কোনো উজ্জ্বল বস্তু হতে অনবরত ঝাঁকে ঝাঁকে অতি ক্ষুদ্র কণা নির্গত হয়। নির্গত এ কণাগুলো প্রচণ্ড গতিতে সরলরেখা বরাবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং যখন আমাদের চোখে গিয়ে আঘাত করে তখন ঐ বস্তু সম্পর্কে আমাদের দর্শনানুভূতি হয়। এ কণাগুলোর আকার বিভিন্ন হয়, আর সে কারণে বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়। এ তত্ত্বের সাহায্যে আলোর ঋজুগতি, প্রতিফলন, প্রতিসরণ ইত্যাদি ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু ব্যতিচার, সমবর্তন, বিচ্ছুরণ ইত্যাদি ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় না।

খ. আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব

স্যার আইজাক নিউটনের সমসাময়িক ডাচ বিজ্ঞানী হাইগেন্স (Huygens) প্রথম ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। পরে ইয়ং, ফ্রেনেল এবং আরও অনেক বিজ্ঞানী এই তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে আলো ইথার নামক এক অদৃশ্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তরঙ্গ আকারে সঞ্চারিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় এবং চোখে পৌঁছালে দর্শনানুভূতি সৃষ্টি করে।

এই তত্ত্বের সাহায্যে আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু সমবর্তন এবং ফটোতড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। পরবর্তীতে মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হয় যে, প্রকৃতিতে ইথার নামক কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই।

গ. তাড়িত চৌম্বক তত্ত্ব [প্রশ্ন: আলোর তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব আলোচনা করুন। (৪৩তম)]

বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল ১৮৬৪ সালে এ তত্ত্ব প্রদান করেন। তড়িৎ চৌম্বক তত্ত্ব অনুসারে, যখন গতিশীল চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্রের দ্রুত পর্যায়বৃত্ত পরিবর্তন ঘটে তখন দৃশ্য ও অদৃশ্য বিকিরণের উদ্ভব হয় যা তরঙ্গ আকারে $3\times10^8 ms^{-1}$ বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এবং এর সঞ্চালনের জন্য ইথারের কল্পনার প্রয়োজন হয় না।

ঘ. আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব [প্রশ্ন: আলোর উপাদান কী? (৩৭তম)]

১৯০০ সালে পদার্থ বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক সর্বপ্রথম কোয়ান্টাম-তত্ত্ব প্রদান করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে আলোকশক্তি কোনো উৎস থেকে অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের আকারে না বেরিয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুচ্ছ বা প্যাকেট আকারে বের হয়। প্লাঙ্কের মতে আলোক নিরবচ্ছিন্ন নয়; পদার্থ হতে এ বিকিরিত তরঙ্গ শক্তি বিচ্ছিন্নভাবে নির্দিষ্ট একক পরিমাণে বা ক্ষুদ্র শক্তির প্যাকেটরূপে বের হয়। এ শক্তির এককের নাম দেয়া হয় আলোর এক কোয়ান্টাম শক্তি (quantum)। পরে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তার 'Photoelectric Effect' এর ব্যাখ্যায় আলোককে নির্দিষ্ট শক্তিযুক্ত ক্ষুদ্র কণা বা ফোটন (photon) এর প্রবাহরূপে উল্লেখ করেন। এসব ফোটনের শক্তির পরিমাণ (E) এদের বিকিরণের ফ্রিকুয়েন্সি বা স্পন্দন সংখ্যার (f) সমানুপাতিক।

$E_{photon} \propto f$ এখানে, E_{photon} = একটি ফোটনের শক্তি।

$E_{photon} = hf$; f = বিকিরণের কম্পাঙ্ক। এর একক (s^{-1}) বা Hertz (Hz)

h = প্লাঙ্কের ধ্রুবক, এর মান 6.626×10^{-34} জুল সেকেন্ড (Js)

$\boxed{E = hf}$, এই সমীকরণকে প্লাঙ্কের সমীকরণ বলা হয়।

ফোটনের ধর্ম

১. শূন্যস্থানে ফোটন চলে আলোর গতিতে।

২. ফোটনের নিশ্চল ভর শূন্য, কিন্তু গতিশীল অবস্থায় এর ভরবেগ থাকে।

৩. E = ফোটনের শক্তি, f = আলোর কম্পাঙ্ক, λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলে, $\boxed{E = hf = \frac{hc}{\lambda}}$, $\left[\because f = \frac{C}{\lambda} \text{ এবং } h = \text{প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক}, C = \text{আলোর বেগ}\right]$

৪. ফোটনের সাথে পদার্থের কণিকার সংঘর্ষ ঘটতে পারে। এ সংঘর্ষে মোট শক্তি ও মোট ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে।

৫. কোনো নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের আলোর তীব্রতা বাড়লে নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফল অতিক্রমকারী ফোটনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিন্তু প্রতিটি ফোটনের শক্তি একই থাকে।

৬. ফোটনের চার্জ নেই। অর্থাৎ এটি তড়িৎ বা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না।

আলোক বর্ষ (Light year)

এক বছরে আলোক রশ্মি যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে 1 আলোক বর্ষ বলে। বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান এবং দূরত্ব প্রকাশের জন্য এই একক ব্যবহার করা হয়।

1 আলোক বর্ষ = শূন্য মাধ্যমে আলোকের বেগ × 1 বছরের সেকেন্ড সংখ্যা

$= 3 \times 10^8 ms^{-1} \times 365 \times 24 \times 60 \times 60 s$

$= 9.46 \times 10^{15} m = 9.46 \times 10^{12} km$

এটি দূরত্ব পরিমাপের বড় একক। নভোমণ্ডলীর পরিমাপে এই একক ব্যবহার করা হয়।

পারসেক (Parsec-pc)

মহাজাগতিক দূরত্ব পরিমাপের একক। দূরত্বের সবচেয়ে বড় একক।

$\boxed{১ \text{ পারসেক} = ৩.২৬ \text{ আলোক বর্ষ}}$

জ্যোতির্বিদ্যায় দূরত্বের একক হিসেবে আলোক বর্ষ, পারসেক ব্যবহৃত হয়।

Electro-Magnetic Spectrum, Different Colours and Wavelengths

তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালি (Electromagnetic Spectrum)

বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল এর তড়িৎ চৌম্বক তত্ত্ব অনুসারে, সব ধরনের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান আলোর উৎপত্তি বিদ্যুৎ ও চুম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে হয়। এজন্য সব ধরনের আলোককে একত্রে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বিকিরণ রশ্মি বলা হয়। এ বিকীর্ণ শক্তি তরঙ্গ সৃষ্টি করে স্পন্দন সহকারে উৎস থেকে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলোর গতিবেগ মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল। শূন্যে আলোর বেগ সেকেন্ডে প্রায় 3×10^8 m। আলোক শক্তি তরঙ্গ হওয়ায় আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও স্পন্দন সংখ্যা বা কম্পাঙ্ক (Frequency) রয়েছে, যা নিম্নরূপে পরস্পরের সাথে ব্যস্তানুপাতিক হয়ে থাকে। তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে λ (ল্যাম্বডা, Lambda) দ্বারা বোঝানো হয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একক হলো মিটার। যে কোনো পর্যায়বৃত্ত (Periodic) তরঙ্গের কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঙ্গে তরঙ্গের গতিবেগের সম্পর্ক হলো,

$$\boxed{v = f\lambda}$$

তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের শূন্য বা বায়ু মাধ্যমে সঞ্চালন ক্ষেত্রে তরঙ্গের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান।

অর্থাৎ $v = c$। সুতরাং $c\ (ms^{-1}) = f\ (s^{-1}) \times \lambda\ (m)$

এখানে, λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য, c = আলোর বেগ এবং ফ্রিকুয়েন্সি f এর একক হলো হার্টজ (Hertz, Hz); $1Hz = 1s^{-1}$

$$\boxed{f = \frac{c}{\lambda}}$$

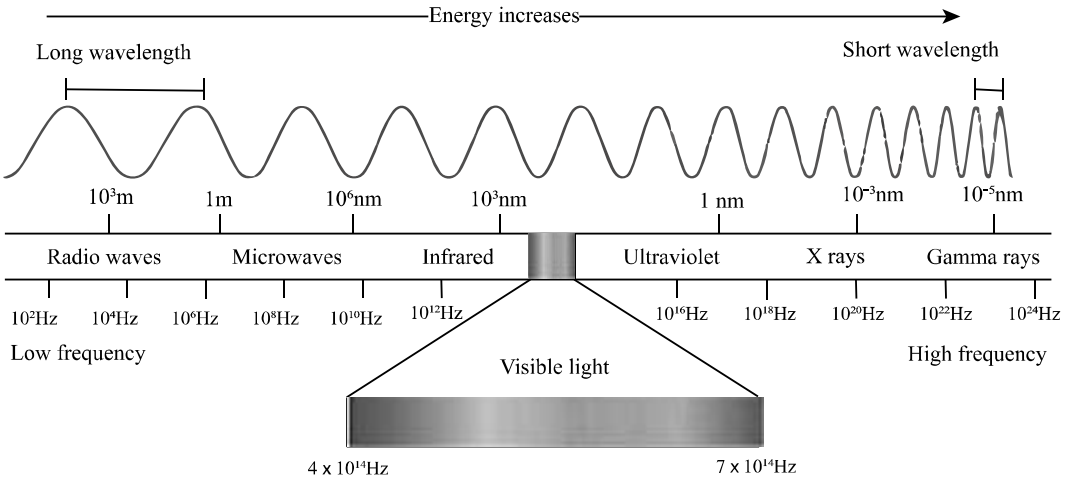

চিত্র: তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালি

তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্কের প্রসার বা পাল্লা (Range) অত্যন্ত বেশি। এর প্রসারতা 10^4 Hz বা সাইকেল/সেকেন্ড-এর কম মান থেকে শুরু করে 10^{23} Hz বা সাইকেল/সেকেন্ড-এর ঊর্ধ্বে পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পরিসরকে তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালি (Electromagnetic spectrum) বলে। তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য অনুসারে বহু আগে থেকেই বিভিন্ন নামকরণ প্রচলিত আছে। যেমন- রেডিও তরঙ্গ, অবলোহিত তরঙ্গ, দৃশ্যমান তরঙ্গ, এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি ইত্যাদি।

যদিও বিভিন্ন তাড়িতচৌম্বক বিকিরণের উৎস বিভিন্ন এবং তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে বিরাট পার্থক্য বর্তমান কিন্তু কিছু কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এদের মধ্যে মিল আছে। এসব বৈশিষ্ট্য হলো:-

- তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ ভ্যাকুয়ামে (শূন্য মাধ্যম) আলোর দ্রুতিতে ($3 \times 10^8 ms^{-1}$) সরলরেখায় চলে।
- উৎস থেকে বিশেষ দূরত্বে বিকিরণের তীব্রতা বিপরীত বর্গীয় নিয়ম (Inverse square law) মেনে চলে। অর্থাৎ দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে এদের তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে। দূরত্ব দ্বিগুণ হলে তীব্রতা এক-চতুর্থাংশ হয়ে যাবে।
- এ তরঙ্গ তাড়িতচৌম্বক এবং আড় তরঙ্গ।
- যথোপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে তাড়িতচৌম্বক বিকিরণের সব ধরনের বিকিরণের মতো **প্রতিফলন, প্রতিসরণ, অপবর্তন** (Diffraction) ও **ব্যতিচার** (Interference) **ঘটে**।
- এদের সঞ্চালনের জন্য কোনো মাধ্যম প্রয়োজন হয় না। শূন্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এরা সঞ্চালিত হতে পারে।

তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালির শ্রেণিবিন্যাস

[প্রশ্ন: শক্তি ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্রমানুসারে বিভিন্ন তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের নাম (৪৩, ৩৭তম) ও ব্যবহার লিখুন। (৪৫তম)]

তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ	তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর	ব্যবহার
বেতার তরঙ্গ বা রেডিও ওয়েভ	10 km – 1 m	বেতার তরঙ্গ বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ারে (তাপমণ্ডল) প্রতিফলিত হয়। রেডিও-টিভির সিগনাল ও MRI যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।
মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ	1 m – 1 mm	**RADAR (Radio Detection and Ranging)**, টেলিভিশন, Wi-Fi, মোবাইল ফোন ও মাইক্রোওভেন প্রযুক্তিতে এই তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।
অবলোহিত বা ইনফ্রারেড (IR) রশ্মি	1 mm – 780 nm	এই বিকিরণের কম্পাঙ্ক লাল রং থেকে কিছুটা কম বলেই এর নামকরণ করা হয়েছে অবলোহিত রশ্মি। রিমোট কন্ট্রোল সংকেত প্রদান, অন্ধকারে দেখার গগলস ইত্যাদি প্রযুক্তিতে ইনফ্রারেড তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসাক্ষেত্রে, জৈব যৌগের কার্যকরী মূলক শনাক্তকরণে, মাংসপেশির ব্যাথা নিরাময়ে, মস্তিষ্কের রোগ নির্ণয়ে, ক্যান্সার বা টিউমার আক্রান্ত কোষের বৃদ্ধি প্রতিহত করতে এ রশ্মি ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও অপটিক্যাল ফাইবার মাধ্যমে ও টেলিস্কোপে (জেমস ওয়েভ টেলিস্কোপ) ব্যবহৃত হয়।
দৃশ্যমান আলো	780 nm – 380 nm	ইহা হলো তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালির সেই অংশ যা মানুষের চোখে দৃশ্যমান, ভিন্ন ভিন্ন রঙের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক ভিন্ন হয়। সালোকসংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণী রসায়নে পদার্থের পরিমাণ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।
অতিবেগুনি বা আল্ট্রাভায়োলেট (UV) রশ্মি	380 nm – 10 nm	এই রশ্মির কম্পাঙ্ক দৃশ্যমান বেগুনি রশ্মির চেয়ে বেশি তাই একে অতিবেগুনি রশ্মি বলে। এটি ত্বকে ভিটামিন-D তৈরিতে সাহায্য করে। চর্ম ক্যান্সার তৈরি করতে সক্ষম। জাল টাকা ও জাল পাসপোর্ট শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়।
এক্সরে	10 nm – 0.01 nm	এই রশ্মির সাহায্যে শরীরের ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছবি তোলা যায়। রঙিন টেলিভিশন হতে এক্স বা রঞ্জন রশ্মি নির্গত হয়।
গামা রশ্মি	Less than 0.01 nm	সর্বাপেক্ষা ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ। তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় থেকে গামা রশ্মি উৎপন্ন হয়। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও ক্ষতিকর। ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা ও খাদ্যশস্যে অণুবীজ ধ্বংসে এটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সিটি স্ক্যান, রেডিও থেরাপিতে ব্যবহৃত হয়।

দৃশ্যমান আলোর বর্ণালি (Spectrum of Visible Light)

সূর্যের সাদা আলো 7টি বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হলো- বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। বর্ণগুলোর নাম ও ক্রম সহজে মনে রাখার জন্য এদের নামের আদ্যক্ষরগুলো নিয়ে বাংলায় বেনীআসহকলা ও ইংরেজিতে VIBGYOR শব্দ গঠন করা হয়েছে। এই বর্ণগুলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সীমা নিচে দেওয়া হলো:

বেগুনি	380 nano meter থেকে 425 nano meter	হলুদ	575 nano meter থেকে 585 nano meter
নীল	425 nano meter থেকে 445 nano meter	কমলা	585 nano meter থেকে 620 nano meter
আসমানি	445 nano meter থেকে 500 nano meter	লাল	620 nano meter থেকে 780 nano meter
সবুজ	500 nano meter থেকে 575 nano meter		

প্রভা

[প্রশ্ন: প্রভা কী? প্রভা কত প্রকার ও কী কী? চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রভার ব্যবহার বর্ণনা করুন। (৪০তম)]

কোনো বস্তু কর্তৃক নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো শোষণ এবং ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করার ঘটনাকে প্রভা বলা হয়। প্রভা তিন প্রকার। যথা:

(১) প্রতিপ্রভা (Fluorescence)
(২) অনুপ্রভা (Phosphorescence) এবং
(৩) তাপাপন (Calorescence)।

১. **প্রতিপ্রভা:** এমন কতকগুলো বস্তু আছে, যেগুলোর ওপর এক বর্ণের আলো পড়লে ভিন্ন জাতীয় আলো বিকিরণ করে এদেরকে প্রতিপ্রভা বস্তু বলে। কোনো প্রতিপ্রভা বস্তুর ওপর যতক্ষণ আলো ফেলা হয় প্রতিপ্রভা ততক্ষণ দেখা যায়। কুইনাইন, ইউরেনিয়াম, সালফেট ইত্যাদি প্রতিপ্রভা বস্তুর উদাহরণ।

২. **অনুপ্রভা:** এমন কতকগুলো বস্তু আছে, যাদের সাদা আলোয় কিছুক্ষণ উন্মুক্ত রেখে আলো সরিয়ে নিলেও অন্ধকারে কিছুক্ষণ আলো দেয়। একে অনুপ্রভা বলে এবং বস্তুগুলোকে অনুপ্রভা বস্তু বলে। ক্যালসিয়াম সালফাইড, ফসফরাস, বেরিয়াম সালফাইড প্রভৃতি অনুপ্রভা বস্তুর উদাহরণ।

৩. **তাপাপন:** কতগুলো বস্তু আছে যেগুলো দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে এবং ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করে। এ ধরনের ঘটনাকে তাপাপন বলে। এক্ষেত্রে সাধারণত অবলোহিত আলো শোষিত হয় এবং দৃশ্যমান আলো নির্গত হয়। কার্বন-ডাই-সালফাইডে আয়োডিন দ্রবণ তাপাপন প্রদর্শন করে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রভার ব্যবহার:

- প্রভার শিশুদের শরীরে Vitamin-D তৈরি করে।
- এন্ডোস্কোপি মেশিনের সাহায্যে দেহের সমস্যা পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রভার ব্যবহৃত হয়।
- দেহে বিলিরুবিনের মাত্রা কমে গেলে থেরাপির কাজে প্রভার ব্যবহৃত হয়।

UV, IR & LASER

অতিবেগুনি রশ্মি (UV)

[প্রশ্ন: অতিবেগুনি রশ্মি কী? এটা কী কী কাজে ব্যবহৃত হয়? (৪০তম) এর প্রভাবে মানবদেহের কি কি ক্ষতি হয়? (৩৭তম)]

অতিবেগুনি রশ্মি (Ultraviolet) এক ধরনের তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর চেয়ে ছোট এবং রঞ্জন রশ্মির (X-ray) চেয়ে বড়। 10^{-9}m বা 1nm থেকে 3.5×10^{-7}m বা 350nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণকে অতিবেগুনি রশ্মি বলে। সূর্য রশ্মি, উত্তপ্ত বস্তু যেমন তড়িৎ বিচ্ছুরণ টিউবের ভেতরে পারদ গ্যাসের মধ্য দিয়ে তড়িৎ ক্ষরণের ফলে অতিবেগুনি রশ্মি উৎপন্ন হয়।

উপকারী দিক	অপকারী দিক
১. মানবদেহে ভিটামিন 'ডি' উৎপাদন করে।	১. এর প্রভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
২. জীবাণুমুক্তকরণে ব্যবহার করা হয়।	২. চর্ম ক্যান্সার হতে পারে।
৩. রং, বীজ, ঔষধ প্রভৃতির বিশুদ্ধতা যাচাই করতে ব্যবহৃত হয়।	৩. চোখে ছানি পড়া ও অন্ধত্বের হার বেড়ে যায়।
৪. ফটোইলেকট্রিক প্রভাব বিশ্লেষণে এটি ব্যবহৃত হয়।	৪. বীজের উৎকর্ষ নষ্ট হয়।
৫. ত্বকের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।	৫. খাদ্যশস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অবলোহিত রশ্মি (Infrared Ray)

বর্ণালিতে 10^{-6}m বা 1 micrometer থেকে 10^{-3}m বা 1mm পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো হলো অবলোহিত বিকিরণ। অবলোহিত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষা সামান্য বড়। তবে একে খালি চোখে দেখা যায় না। সূর্য, কাঠের আগুন, বৈদ্যুতিক চুলা ইত্যাদি থেকে এ তাপ বিকীর্ণ হয়।

ব্যবহার

১. মাংসপেশির ব্যথা নিরাময়ে, ২. অন্ধকারে ছবি তুলতে, ৩. আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে,
৪. চর্ম ও বাতের চিকিৎসায়, ৫. শিল্প কারখানায়, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এবং
৬. টিভি, সিডি প্লেয়ার, মিউজিক সিস্টেমসহ যাবতীয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রের রিমোট কন্ট্রোলে অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

লেজার (LASER)

[প্রশ্ন: কোন কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে **LASER** আলো সাধারণ আলো হতে আলাদা? (৪৭তম); **LASER** কী? এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার আলোচনা করুন। (৪৫তম)]

আলোক তরঙ্গকে কোনো স্ফটিকের মধ্য দিয়ে চালনা করা হলে ফোটন কণিকার উদ্দীপিত নিঃসরণ ঘটে এবং অতি শক্তিশালী সুসংগত আলোক রশ্মি নিঃসরিত হয়। এই রশ্মিকে বলে লেজার রশ্মি। LASER শব্দটির পূর্ণরূপ হলো- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation। বিজ্ঞানী মাইম্যান ১৯৬০ সালে লেজার রশ্মি আবিষ্কার করেন। এ রশ্মি অত্যধিক লক্ষ্যভেদী, সুসংগত, একক রঙের এবং অনেক দূরত্ব অতিক্রম করার পরও এই রশ্মির দিক বিচ্যুতি ঘটে না।

বৈশিষ্ট্য

১. এ রশ্মির তীব্রতা খুব বেশি।
২. এ রশ্মি প্রায় নিখুঁতভাবে সমান্তরাল হয়।
৩. এ রশ্মি একবর্ণী (monochromatic) হয়।
৪. এ রশ্মির দশা সুসংগত (coherent)।
৫. পানি দ্বারা এ রশ্মি শোষিত হয় না।
৬. এটি একক দিকাভিমুখি।

Laser এর উৎপাদন প্রক্রিয়া: আলোক উৎস থেকে আলো নিঃসৃত হয়ে কোনো ধাতব বস্তুর ওপর পরলে পরমাণু আলোর ফোটন শোষণ করে উত্তেজিত হয়। উত্তেজিত হয়ে ইলেকট্রনটি তার মূল শক্তিস্তর থেকে উচ্চতর শক্তিস্তরে চলে যায়। উত্তেজিত অবস্থায় থাকাকালে এটি যে শক্তির ফোটন (hf) নিঃসৃত করত সেই শক্তিসম্পন্ন ফোটন উত্তেজিত ইলেকট্রনের ওপর আপতিত হলে এটি নিম্নস্তরে ফিরে আসে এবং নিঃসৃত ফোটন ও আপতিত ফোটন মিলে দুটি ফোটন নির্গত হয়। একে উদ্দীপিত নিঃসরণ বা লেজার রশ্মি বলে।

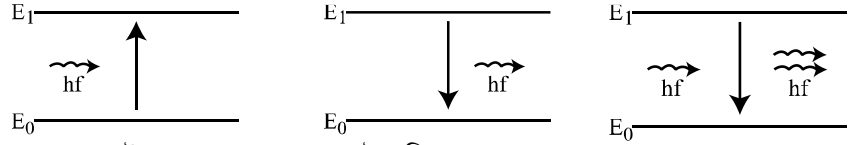

ক. আলোর ফোটন শোষণ এবং পরমাণু উচ্চশক্তি স্তরে গমন
খ. উত্তেজিত স্তর থেকে পরমাণু নিম্নস্তরে গমন
গ. উদ্দীপিত নিঃসরণ

চিত্র: Laser রশ্মি উৎপাদন প্রক্রিয়া

ব্যবহার:

১. পরীক্ষাগারে এই রশ্মির সাহায্যে আলোর বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করা যায়।
২. যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়।
৩. কঠিন বস্তুতে গর্ত করা, জোড়া বা ঝালাই করার কাজে উচ্চশক্তির লেজার ব্যবহৃত হয়।
৪. চিকিৎসাক্ষেত্রে সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত হয়।
৫. সঠিকভাবে দূরত্ব মাপা যায়, যেমন- পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব।
৬. ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের ছবি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে হলোগ্রাফি বলে।
৭. পানি দ্বারা সহজে শোষিত হয় না বলে পানির নিচে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এ রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

Reflection of Light

প্রতিফলন

আলো যখন বায়ু বা অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় অন্য কোনো মাধ্যমে বাধা পায় তখন দুই মাধ্যমের বিভেদ তল থেকে কিছু পরিমাণ আলো প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। একে আলোর প্রতিফলন বলে।

যে পৃষ্ঠ থেকে বাধা পেয়ে আলোক রশ্মি ফিরে আসে তাকে প্রতিফলক পৃষ্ঠ বলে। আপতিত রশ্মি লম্বের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে, সেটাকে বলে আপতন কোণ (i), প্রতিফলিত রশ্মি লম্বের সাথে যে কোণ (r) উৎপন্ন করে, সেটাকে বলে প্রতিফলন কোণ।

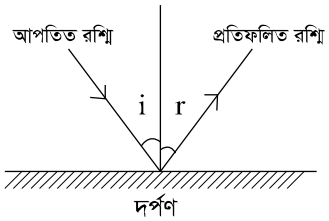

চিত্র: প্রতিফলন

আপতিত আলোর কতটুকু প্রতিফলিত হবে তা ২টি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে; যথা-

১. আপতিত আলো প্রতিফলকের উপর কত কোণে আপতিত হচ্ছে; এবং
২. প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রকৃতি।

আপতিত রশ্মি যত বেশি কোণে আপতিত হয়, প্রতিফলনের পরিমাণও তত বেশি হয়। আবার প্রতিফলক যত মসৃণ হয় আলো তত বেশি প্রতিফলিত হয়, পক্ষান্তরে স্বচ্ছ প্রতিফলক থেকে আলো প্রতিফলিত হয় কম। দেখা গেছে, বায়ু মাধ্যম থেকে কাচ মাধ্যমে আলো যদি লম্বভাবে আপতিত হয় তাহলে প্রায় ৪.৫% পরিমাণ আলো প্রতিফলিত হয়। কিন্তু প্রতিফলক যদি সমতল দর্পণ হয় তাহলে প্রায় ৪০% আলো প্রতিফলিত হয়। আবার কোনো কালো বস্তুর উপর আলো পড়লে তা প্রকৃতপক্ষে প্রতিফলিত হয় না বরং ঐ তল কর্তৃক শোষিত হয়। এ জন্য ক্যামেরা, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি আলোকীয় যন্ত্রের ভিতরের অংশ কালো করা হয়। আবার কোনো সাদা তলের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে। সাদা তল সব রঙের আলোই প্রতিফলিত করে, তাই সিনেমায় সাদা রঙের পর্দা ব্যবহার করা হয়। এতে বিম্বের ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যায়।

প্রতিফলনের প্রকারভেদ

[প্রশ্ন: আলোর প্রতিফলন কত প্রকার ও কী কী? ব্যাখ্যা করুন। (৪৫তম)]

প্রতিফলক পৃষ্ঠের প্রকৃতি অনুসারে প্রতিফলন দুই প্রকারের হতে পারে; যথা: -

১. নিয়মিত প্রতিফলন (Regular reflection)
২. ব্যাপ্ত প্রতিফলন (Diffused reflection)

১. নিয়মিত প্রতিফলন (Regular reflection)

যদি একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি কোনো পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর রশ্মিগুচ্ছ যদি সমান্তরাল থাকে বা অভিসারী বা অপসারীগুচ্ছে পরিণত হয় তবে আলোর সেই প্রতিফলনকে নিয়মিত প্রতিফলন বলে।

প্রতিফলক পৃষ্ঠ মসৃণ হলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে। সমতল দর্পণে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আলোক রশ্মির আপতন কোণ সমান হয় এবং প্রতিফলন কোণগুলোও সমান হয়।

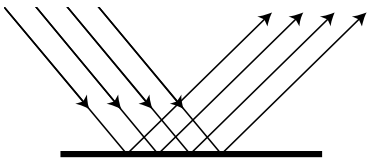
চিত্র: নিয়মিত প্রতিফলন

২. ব্যাপ্ত প্রতিফলন (Diffused reflection)

যদি এক গুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি কোনো পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর আর সমান্তরাল থাকে না বা অভিসারী বা অপসারীগুচ্ছে পরিণত হয় না তখন আলোর সেই প্রতিফলনকে ব্যাপ্ত প্রতিফলন বলে।

প্রতিফলক পৃষ্ঠ মসৃণ না হলে এরূপ ঘটে। এ ক্ষেত্রে সমান্তরাল রশ্মিগুলো প্রতিফলক পৃষ্ঠের বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন কোণে আপতিত হয়, ফলে তাদের প্রতিফলন কোণও বিভিন্ন হয়। এতে প্রতিফলিত রশ্মিগুলো আর সমান্তরাল থাকে না, বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

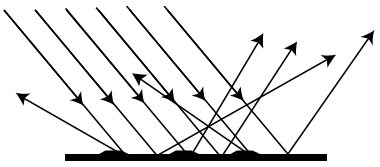
চিত্র: ব্যাপ্ত প্রতিফলন

প্রতিফলনের সূত্র (Laws of Reflection of Light)

আলোর প্রতিফলন দুটি সূত্র মেনে চলে। যথা:

প্রথম সূত্র: আপতিত রশ্মি, আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব এবং প্রতিফলিত রশ্মি একই সমতলে থাকে।

দ্বিতীয় সূত্র: আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সর্বদা সমান হয়। অর্থাৎ, $\angle i = \angle r$

দর্পণ (Mirror)

যে মসৃণ তলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে দর্পণ বলে। দর্পণে আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণের মান সমান হয়। সাধারণত কাচের একদিকে ধাতুর (সাধারণত রুপা অথবা মার্কারির) প্রলেপ দিয়ে দর্পণ তৈরি করা হয়। কাচের উপর ধাতুর প্রলেপ দেওয়াকে পারা লাগানো বা সিলভারিং বলে।

দর্পণ দুই প্রকার। যথা: - ১. সমতল দর্পণ ২. গোলীয় দর্পণ

১. সমতল দর্পণ (Plane mirror)

কোনো সমতল পৃষ্ঠ যদি মসৃণ হয় এবং তাতে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তবে তাকে সমতল দর্পণ বলে। একটি সমতল দর্পণ হতে বস্তুর দূরত্ব যত, দর্পণ হতে বিম্বের দূরত্বও তত হয়। সমতল দর্পণে নিজের পূর্ণ বিম্ব দেখতে হলে দর্পণের দৈর্ঘ্য দর্শকের উচ্চতার কমপক্ষে অর্ধেক হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত মানুষ নিজের চেহারা দেখতে সমতল দর্পণ ব্যবহার করে থাকে।

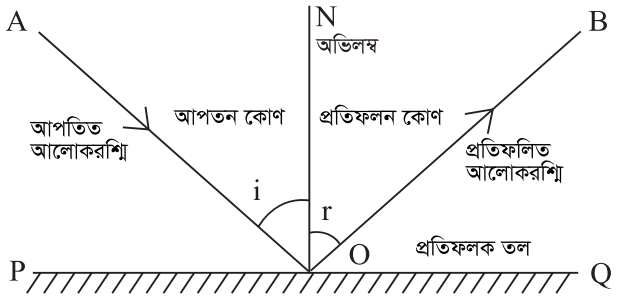

চিত্র: সমতল দর্পণ

সরল পেরিস্কোপ (Simple periscope)

দুইটি সমতল দর্পণের সাহায্যে আলোর প্রতিফলন ও ব্যতিচার নীতির উপর ভিত্তি করে পেরিস্কোপ তৈরি হয়। পেরিস্কোপে আয়নাগুলো ৪৫° কোণে সাজানো থাকে।

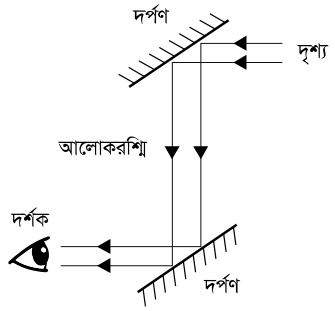

চিত্র: পেরিস্কোপের কার্যপ্রণালি

ব্যবহার

১. কোনো দূরের জিনিস সোজাসুজি দেখতে বাধা থাকলে ব্যবহৃত হয়।
২. ভিড় এড়িয়ে খেলা দেখতে।
৩. শত্রু সৈন্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের কাজে।
৪. ডুবোজাহাজ বা সাবমেরিনের নাবিকেরা পেরিস্কোপের সাহায্যে পানির নিচু থেকে উপরের দৃশ্য দেখে।

২. গোলীয় দর্পণ (Spherical mirror)

যে দর্পণের প্রতিফলক পৃষ্ঠ কোনো গোলকের অংশবিশেষ তাকে গোলীয় দর্পণ বলে।
গোলীয় দর্পণ ২ প্রকার। যথা: - ক. উত্তল দর্পণ খ. অবতল দর্পণ।

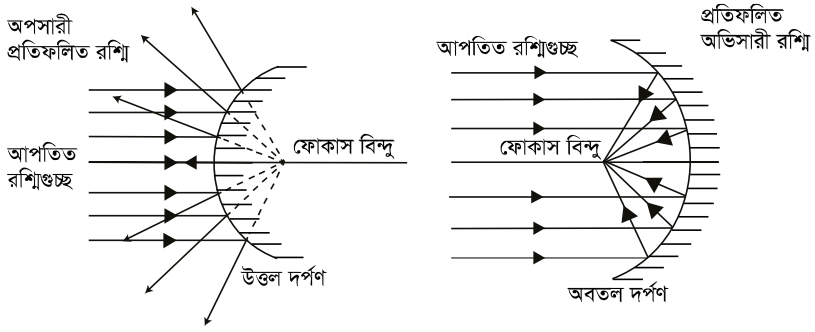

চিত্র: উত্তল ও অবতল দর্পণ

ক. উত্তল দর্পণ (Convex Mirror)

যে গোলীয় দর্পণ কোনো গোলকের উপরি পৃষ্ঠে তৈরি করা হয় তাকে উত্তল দর্পণ বলে। এই ধরনের গোলীয় দর্পণ তার উপর পতিত আলোক রশ্মিকে ছড়িয়ে দেয় অর্থাৎ রশ্মিগুলো অপসারি হয়। পিছনের যানবাহন বা পথচারী দেখার জন্য গাড়িতে, মোটর গাড়ির হেডলাইট, রাস্তার লাইটে প্রতিফলক হিসেবে ইত্যাদি ক্ষেত্রে উত্তল দর্পণ ব্যবহৃত হয়।

খ. অবতল দর্পণ (Concave Mirror)

যে গোলীয় দর্পণ কোনো গোলকের ভিতরে পৃষ্ঠে তৈরি করা হয় তাকে অবতল দর্পণ বলা হয়। এই ধরনের গোলীয় দর্পণ তার উপর আপতিত আলোক রশ্মিকে এক বিন্দুতে মিলিয়ে দেয় অর্থাৎ রশ্মিগুলো অভিসারী হয়। বিবর্ধিত বিম্ব তৈরি করা যায় বলে রূপচর্চা করার এবং দাঁড়ি কাটার সময় অবতল দর্পণ ব্যবহৃত হয়। ডাক্তাররা চোখ, নাক, কান ও গলা পর্যবেক্ষণ করার সময় এই দর্পণ ব্যবহার করেন। নভো দূরবীক্ষণে, স্টিমারের সার্চ লাইটের প্রতিফলক হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হয়।

বিম্ব (Image)

কোনো বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে যদি দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় বা দ্বিতীয় কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, তাহলে ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর বিম্ব বলে। বিম্ব খর্বিত, বিবর্ধিত, সদ, অসদ, সোজা, উলটো ইত্যাদি হতে পারে।

বিম্বের প্রকারভেদ:

বিম্ব ২ প্রকার। যথা: সদ বা বাস্তব বিম্ব এবং অসদ বা আবাস্তব বিম্ব

বাস্তব বিম্ব: যে বিম্ব আলোকরশ্মির প্রকৃত মিলনের ফলে তৈরি হয় তাকে বাস্তব বিম্ব বলে। বাস্তব বিম্বকে পর্দায় ফেল যায়। সাধারণত উত্তল লেন্স বা অবতল দর্পণে বাস্তব বা সদ বিম্ব গঠিত হয়।

অবাস্তব বিম্ব: যে বিম্ব আলোকরশ্মির প্রকৃত মিলনের ফলে তৈরি হয় না তাকে অবাস্তর বা অসদ বিম্ব বলে। এই বিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় না সাধারণত অবতল লেন্স বা উত্তল দর্পনে অবাস্তব বিম্ব গঠিত হয়। আমরা আয়নার যে নিজের চেহারা দেখি সেটাও এক প্রকার অবাস্তব বিম্ব।

Total Internal Reflection of Light

সংকট কোণ (ক্রান্তি কোণ)

নির্দিষ্ট রঙের আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রতিসরিত হওয়ার সময় আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণের মান এক সমকোণ হয় অর্থাৎ প্রতিসরিত রশ্মি বিভেদ তল ঘেঁষে চলে যায় তাকে ঐ রঙের জন্য হালকা মাধ্যমের সাপেক্ষে ঘন মাধ্যমের সংকট কোণ বা ক্রান্তি কোণ (Critical angle) বলে। সংকট কোণ বা ক্রান্তি কোণকে θ_c দ্বারা প্রকাশ করা হয়। পানির সাপেক্ষে হীরকের ক্রান্তি কোণ 33° বলতে বোঝায় হীরক থেকে আলোকরশ্মি পানিতে প্রতিসরিত হওয়ার সময় আপতন কোণ 33° হলে আলোকরশ্মি পানি ও হীরকের বিভেদ তল ঘেঁষে যাবে অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ 90° হবে।

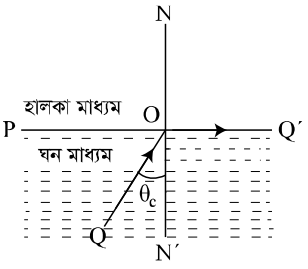

চিত্র: সংকট কোণ

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (Total Internal Reflection)

[প্রশ্ন: পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সংজ্ঞা দিন। (৪৪তম)]

আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় মানের কোণে আপতিত হয় তখন প্রতিসরণের পরিবর্তে আলোকরশ্মি সম্পূর্ণরূপে ঘন মাধ্যমের অভ্যন্তরে প্রতিফলিত হয়। এই ঘটনাকেই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

আলোক রশ্মি যখন ঘন স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে হালকা স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন প্রতিসরিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। ফলে প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণের চেয়ে বড় হয়। আপতন কোণের মান ক্রমশ বাড়তে থাকলে প্রতিসরণ কোণও অনুরূপভাবে বাড়তে থাকে। এভাবে যখন আপতন কোণের মান সংকট কোণের (θ_c) চেয়ে বেশি হয় তখন আলোক রশ্মি আর প্রতিসরিত না হয়ে বিভেদ তল থেকে একই মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে আসবে। এ ক্ষেত্রে বিভেদ তল প্রতিফলক হিসেবে কাজ করে এবং এই প্রতিফলন সাধারণ প্রতিফলনের নিয়মানুসারে হয়। এই ঘটনাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলা হয়। অর্থাৎ ঘন মাধ্যম থেকে আপতিত রশ্মি তখন দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে সাধারণ প্রতিফলনের নিয়মানুসারে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে আবার ঘন মাধ্যমেই ফিরে আসে।

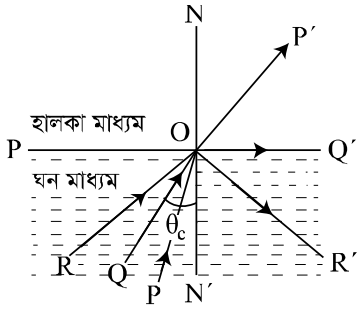

চিত্র: পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

চিত্র অনুসারে PO আপতিত রশ্মির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে ছোট, যার প্রতিসরিত রশ্মি হলো OP′। QO আপতিত রশ্মিটির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের (θ_c) সমান। যার প্রতিসরিত রশ্মি হলো OQ′ রশ্মি এবং এটি বিভেদ তল বরাবর প্রতিসরিত হয়েছে অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ 90°। RO রশ্মিটির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের (θ_c) চেয়ে বড়। এক্ষেত্রে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়েছে OR′, এটি প্রতিফলিত রশ্মি। সাধারণ প্রতিফলনের সাথে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের পার্থক্য হলো, সাধারণ প্রতিফলনের সময় দেখা যায় আলোর কিছু না কিছু অংশ প্রতিসরিত হয়; কিন্তু পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে দেখা যায় এক্ষেত্রে সমস্ত আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়।

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্ত

১. আলোক রশ্মি কেবল ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় এটি ঘটে।
২. আপতন কোণ অবশ্যই সংকট কোণ বা ক্রান্তি কোণের (θ_c) চেয়ে বড় হতে হবে।

আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের কারণে

১. হীরক উজ্জ্বল দেখায়। ২. পদ্ম পাতার উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে চকচক করে।

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের বাস্তব উদাহরণ [প্রশ্ন: মরীচিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন। (৪৪তম)]

১. মরুভূমিতে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে বালি তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়। ফলে বালি সংলগ্ন বায়ুর তাপমাত্রা বেশি থাকে। এতে বালি সংলগ্ন বায়ু হালকা হয়। কিন্তু যত উপরে যাওয়া যায় বায়ুর তাপমাত্রা কমে বায়ু মাধ্যম ঘনতর হতে থাকে। ফলে দূরের কোনো গাছ থেকে আলোকরশ্মি পূর্ণ অভ্যন্তরীণভাবে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে এবং আমরা গাছের উলটো বিম্ব দেখি। কিন্তু আমাদের কাছে মনে হবে যে, ভূপৃষ্ঠে গাছের প্রতিফলন হয়েছে এবং এখানে জলাশয় আছে, এটাকে মরীচিকা বলে।

২. গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত পিচঢালা মসৃণ রাজপথে মরীচিকা দেখা যেতে পারে। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে রাজপথে আকাশের বিম্ব দেখে মনে হয় রাজপথ ভেজা এবং সেখানে আলোর প্রতিফলন ঘটেছে।

অপটিক্যাল ফাইবার

[প্রশ্ন: **Fibre Optic Communication**- এর ক্ষেত্রে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এর গুরুত্ব কী? (৪৭তম)]

অপটিক্যাল ফাইবার হলো খুব সরু নমনীয় কাচ তন্তু যা আলোক রশ্মি বহন করে এবং এর মধ্য দিয়ে তথ্য আদান প্রদান হয়। অপটিক্যাল ফাইবার অত্যন্ত সরু কাচের তন্তু, এর ভেতরের অংশকে বলে কোন (Core), বাইরের অংশকে বলে ক্ল্যাড (Clad)। দুটিই একই কাচ দিয়ে তৈরি হলেও ভেতরের অংশের (কোর) প্রতিসারনাঙ্ক বাইরের অংশ থেকে বেশি। এ কারণে আলোক পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে কোরের মাঝে আটকে রেখে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া যায়।, কারণ এই কাচের তন্তুতে আলোর শোষণ হয় খুবই কম। দৃশ্যমান আলো হলে শোষণ বেশি হতো বলে ফাইবারে লম্বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

অপটিক্যাল ফাইবার

ব্যবহার

১. মানবদেহে ভেতরের কোনো অংশের ছবি তুলতে ব্যবহৃত হয়। যেমন- কোলনোস্কপি, এন্ডোস্কপি।
২. টেলিকমিউনিকেশনের জন্য তথ্য আদান প্রদানে এ ফাইবার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
৩. সাবমেরিন ক্যাবলে ব্যবহার করা হয়।

Refraction of Light

আলোর প্রতিসরণ

[প্রশ্ন: আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে? (৪১তম)]

আলোকরশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদ তলে তীর্যকভাবে আপতিত আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তন করার ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।

প্রতিসরণাঙ্ক: আলোকরশ্মি a মাধ্যম থেকে b মাধ্যমে প্রবেশ করছে। যেখানে θ_i আপতন কোণ এবং θ_r প্রতিসরণ কোণ। প্রতিসরাঙ্ক হলো কোনো আলোকীয় মাধ্যমের উপাদানের এমন একটি ধর্ম যার মানের উপর ওই মাধ্যমে প্রবেশ করা অর্থাৎ প্রতিসৃত আলোকরশ্মির গতির অভিমুখে এবং ওই মাধ্যমের আলোর বেগের মান নির্ভর করে। দুটি সমজাতীয় রাশির অনুপাত হওয়ায় প্রতিসরাঙ্ক একটি এককবিহীন সংখ্যা মাত্র। প্রতিসরণাঙ্ককে দু'ভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা:

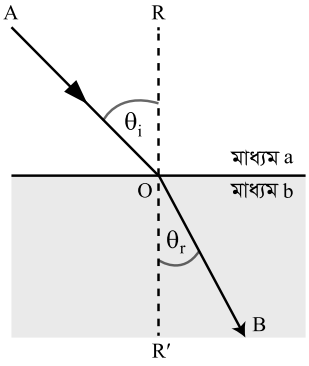

চিত্র: আলোর প্রতিসরণ রাশি

১. **আপেক্ষিক প্রতিসরণাঙ্ক:** কোনো নির্দিষ্ট রংঙের আলো যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে তখন আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত যে ধ্রুব সংখ্যা হয় তাকে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক (Relative Refractive Index) বলে। 'a' মাধ্যমের সাপেক্ষে 'b' মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক হবে: $\boxed{{}_a\mu_b = \frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_r}}$

২. **পরম প্রতিসরণাঙ্ক:** কোনো নির্দিষ্ট রংঙের আলো যখন শূন্য মাধ্যম থেকে কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে তখন আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাতকে উক্ত মাধ্যমটির পরম প্রতিসরণাঙ্ক (Absolute Refractive Index) বলে। উক্ত a মাধ্যমটির পরম প্রতিসরণাঙ্ক হবে: $\boxed{\mu_a = \frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_r}}$

উদাহরণস্বরূপ: পানির প্রতিসরণাঙ্ক 1.33 বলতে বুঝায় যে, আলোকরশ্মি যদি বায়ু মাধ্যমে থেকে পানিতে প্রবেশ করে তাহলে আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা 1.33 হবে।

প্রতিসরণের সূত্র

[প্রশ্ন: আলোর প্রতিসরণের নিয়মগুলো লিখুন। (৪১তম)]

আলোর প্রতিসরণ দুটি সূত্র মেনে চলে। যথা:

প্রথম সূত্র: আপতিত রশ্মি, আপতন বিন্দুতে বিভেদ তলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব এবং প্রতিসরিত রশ্মি সেই একই সমতলে থাকে।

দ্বিতীয় সূত্র: প্রথম মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক n_1; দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক n_2, আপতন কোণ θ_1 এবং প্রতিসরণ কোণ θ_2, হলে-

$$\boxed{n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2}$$

যদি প্রথম মাধ্যমটি বাতাস হয় তাহলে $n_1 = 1$ ধরে লিখতে পারি- $n_2 = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}$

যেহেতু n_2 এর মান 1 থেকে বেশি তাই $\theta_2 < \theta_1$ অর্থাৎ প্রতিসরণের পর আলোক রশ্মিটি অভিলম্বের দিকে বেঁকে যাবে। n বেশি হলে আমরা অনেক সময় তাকে ঘন মাধ্যম বলি। কাজেই প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা বলতে পারি আলো হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যাবার সময় প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্বের দিকে বেঁকে যাবে। আবার ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবার সময় সেটি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে। (চিত্র ১.৫)

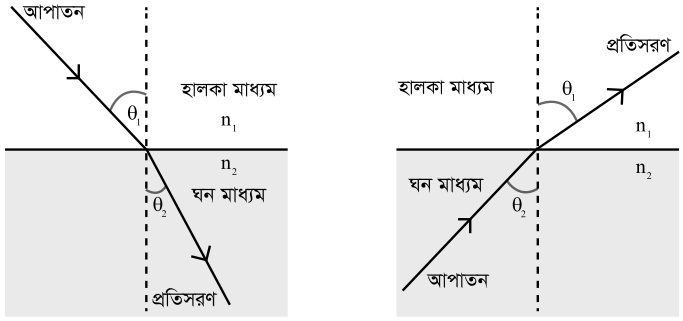

চিত্র: আলোর প্রতিসরণ

আলোর প্রতিসরণের কিছু উদাহরণ

[প্রশ্ন: পানিতে পুঁতে রাখা বাঁশের খুঁটির ছায়া পানিতে বাঁকা দেখায় কেনো? (৩৮তম)]

১. আলোর প্রতিসরণের জন্য পানিতে পুঁতে রাখা বাঁশের খুঁটির ছায়া পানিতে বাঁকা দেখা যায়। কারণ বাঁশের খুঁটির যে অংশ পানির নিচে থাকে, সেটি থেকে প্রতিফলিত আলো যখন পানির মধ্যে দিয়ে বাতাসে আসে, তখন আলোর দিক পরিবর্তন হয়।

২. চাঁদ দিগন্তের কাছে অনেক বড় দেখায়।

৩. বায়ুমণ্ডলীয় আলোর প্রতিসরণের জন্য সূর্যোদয়ের খানিকটা পূর্বে ও পরে সূর্যকে দেখা যায়।

৪. আলোর প্রতিসরণের কারণেই রাতের আকাশে তারাগুলো ঝিকিমিকি করে বলে মনে হয়।

Lens

লেন্স

দুটি গোলীয় বা একটি সমতল অথবা দুটি বেলনাকৃতি অথবা একটি বেলনাকৃতি ও একটি সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনো স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমকে লেন্স বলে। লেন্সের ক্ষমতার একক ডায়প্টার। লেন্স প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

১. উত্তল লেন্স বা অভিসারী লেন্স, ২. অবতল লেন্স বা অপসারী লেন্স

১. উত্তল লেন্স (Convex Lens)

যে লেন্সের মধ্যভাগ মোটা ও প্রান্ত সরু তাকে **উত্তল লেন্স** বলে। উত্তল লেন্সে আলোক রশ্মি উত্তল পৃষ্ঠে আপতিত হয় বলে তাকে উত্তল লেন্স বলে। এ লেন্স সাধারণত **এক গুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মিকে অভিসারী করে থাকে** বলে একে **অভিসারী লেন্সও** বলা হয়।

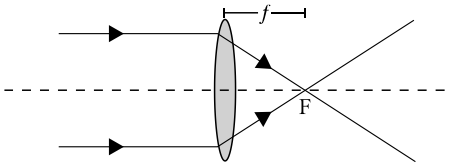

চিত্র: উত্তল লেন্স

ব্যবহার:

- আতশি কাচ হিসেবে এবং আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।
- চশমা, ক্যামেরা, বিবর্ধক কাচ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি আলোক যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

উত্তল লেন্স তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যথা:

উভোত্তল বা দ্বি-উত্তল লেন্স	অবতল উত্তল বা অবতলোত্তল লেন্স	সমতল-উত্তল বা সমতলোত্তল লেন্স
যে উত্তল লেন্সের উভয় তলই উত্তল তাকে উভোত্তল লেন্স বলে।	এই লেন্সের এক পৃষ্ঠ অবতল ও বিপরীত পৃষ্ঠ উত্তল।	এই লেন্সের এক পৃষ্ঠ সমতল এবং বিপরীত পৃষ্ঠ উত্তল।

২. অবতল লেন্স (Concave Lens)

যে লেন্সের মধ্যভাগ সরু ও প্রান্তের দিক মোটা তাকে **অবতল লেন্স** বলে। অবতল লেন্সে আলোক রশ্মি অবতল পৃষ্ঠে আপতিত হয় বলে তাকে অবতল লেন্স বলে। এ লেন্স সাধারণত এক গুচ্ছ আলোক রশ্মিকে **অপসারী করে** থাকে, এজন্য একে অপসারী লেন্সও বলা হয়।

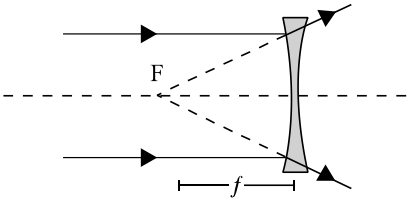

চিত্র: অবতল লেন্স

ব্যবহার:

- **প্রধানত চশমায় ব্যবহৃত** হয়।
- **গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র** এবং **সিনেমাস্কোপ প্রজেক্টরে** অবতল লেন্স ব্যবহার করা হয়।

অবতল লেন্সকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

উভাবতল বা দ্বি-অবতল লেন্স	উত্তল-অবতল বা উত্তলাবতল লেন্স	সমতল অবতল বা সমতলাবতল লেন্স
উভাবতল লেন্সের উভয় পৃষ্ঠই অবতল হয়।	এই লেন্সের এক পৃষ্ঠ উত্তল এবং অন্য পৃষ্ঠ অবতল হয়।	সমতলাবতল লেন্সের এক পৃষ্ঠ সমতল এবং বিপরীত পৃষ্ঠ অবতল হয়।
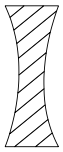		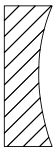

কোনো যন্ত্র ছাড়া লেন্স শনাক্তকরণ [প্রশ্ন: কোনো যন্ত্র ছাড়া কীভাবে লেন্স শনাক্ত করা যাবে? (৪৪তম)]

উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে কোনো লক্ষ্যবস্তু থাকলে সেই বস্তুর অসদ, সোজা, ও বিবর্ধিত বিম্ব গঠিত হয়। আবার অবতল লেন্সের সামনে বস্তু থাকলে তার অসদ, সোজা ও খর্বিত বিম্ব গঠিত হয়। সুতরাং লেন্স শনাক্ত করার জন্য লেন্সের সামনে খুব কাছাকাছি একটি আঙুল রেখে অপর দিক থেকে দেখলে যদি আঙুলের সোজা ও বিবর্ধিত বিম্ব গঠিত হয় সেই লেন্স উত্তল আর যদি সোজা কিন্তু খর্বিত প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাহলে সেই লেন্স অবতল।

উত্তল লেন্স ও অবতল লেন্স এর পার্থক্য

উত্তল লেন্স	অবতল লেন্স
১. উত্তল লেন্সের মধ্যভাগ মোটা এবং প্রান্ত বা কিনারার দিক ক্রমশ সরু।	১. অবতল লেন্সের মধ্যভাগ সরু এবং প্রান্ত বা কিনারার দিক ক্রমশ মোটা।
২. আলোক রশ্মি উত্তল পৃষ্ঠে আপতিত হয়।	২. আলোক রশ্মি অবতল পৃষ্ঠে আপতিত হয়।
৩. উত্তল লেন্স সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকে অভিসারী করে থাকে।	৩. অবতল লেন্স সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকে অপসারী করে থাকে।
৪. এটি একটি অভিসারী লেন্স।	৪. এটি অপসারী লেন্স।
৫. এই লেন্সে বাস্তব ও অবাস্তব দুই ধরনের বিম্বই তৈরি হয়।	৫. এই লেন্সে সর্বদা অবাস্তব বিম্ব তৈরি হয়।

লেন্স সম্পর্কিত কিছু সংজ্ঞা

আলোক কেন্দ্র: কোনো আলোক রশ্মি যদি কোনো লেন্সের এক পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে নির্গত হওয়ার সময় আপাতত রশ্মির সমান্তরালভাবে নির্গত হয় তাহলে সেই রশ্মি লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর যে বিন্দু দিয়ে যায়, সেই বিন্দুকে লেন্সের আলোক কেন্দ্র বলে। চিত্রে C হলো লেন্সের আলোক কেন্দ্র।

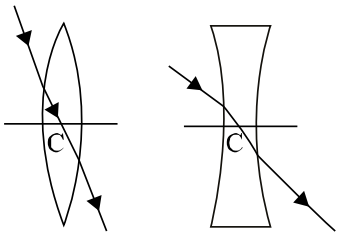

চিত্র: লেন্সের আলোক কেন্দ্র

প্রধান ফোকাস: লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এবং নিকটবর্তী রশ্মিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের উপর যে বিন্দুতে মিলিত হয় (উত্তল লেন্সে) বা যে বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় (অবতল লেন্সে), সেই বিন্দুকে প্রধান ফোকাস বলে।

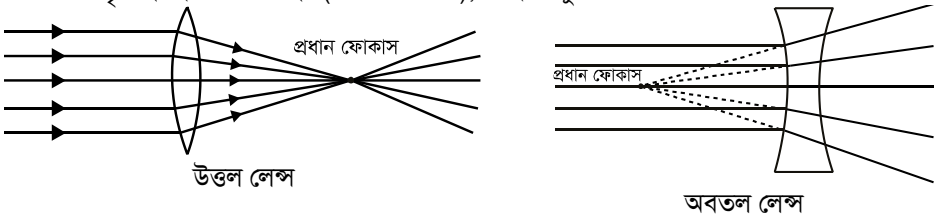

উত্তল লেন্স অবতল লেন্স

চিত্র: প্রধান ফোকাস

লেন্সের ফোকাস দূরত্ব: লেন্সের আলোক কেন্দ্র থেকে প্রধান ফোকাস বা দ্বিতীয় ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বলে।

লেন্সের ক্ষমতা এবং ফোকাস দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক, $\boxed{P = \frac{1}{\text{ফোকাস দূরত্ব (f)}}}$

লেন্সের ক্ষমতা (Power of Lens)

কোনো লেন্সের ক্ষমতা বলতে লেন্সটি তার উপর আপতিত একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মিকে কী পরিমাণ অভিসারী বা অপসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত করতে পারে তা বুঝায়।

সুতরাং লেন্সের ক্ষমতা বলতে এর ফোকাস দূরত্বের বিপরীত (Reciprocal) সংখ্যাকে বুঝায়। অর্থাৎ কোনো লেন্সের ফোকাস দূরত্ব f এবং এর ক্ষমতা P হলে, $P = \frac{1}{f}$

লেন্সের ক্ষমতার একক: 1m ফোকাস দূরত্বের কোনো লেন্সের ক্ষমতাকে 1 ডায়প্টার (Diopter বা D) বলে।

$$\therefore P = \frac{1}{f(m)} D$$

উত্তল লেন্সের ক্ষমতাকে ধনাত্মক এবং অবতল লেন্সের ক্ষমতাকে ঋণাত্মক ধরা হয়।

কোনো লেন্সের ক্ষমতা – 4D বলতে বুঝায় যে, এটি একটি অবতল লেন্স এবং এর ফোকাস দূরত্ব, $f = -\frac{1}{4} m = -25 \text{ cm}$

অনুরূপভাবে কোনো লেন্সের ক্ষমতা +2D হলে, এটি 50 cm ফোকাস দূরত্বের একটি উত্তল লেন্স নির্দেশ করে।

আমরা কীভাবে দেখতে পাই

চোখের উপাদানগুলোর মাঝে রয়েছে রেটিনা, চোখের লেন্স, অ্যাকুয়াস হিউমার, ভিট্রিয়াস হিউমার এবং কর্ণিয়া। এই উপাদানগুলো মিলিতভাবে একটি উত্তল লেন্সের মতো কাজ করে। উৎপন্ন বাস্তব, উলটো বিম্ব রেটিনায় তৈরি হয়।

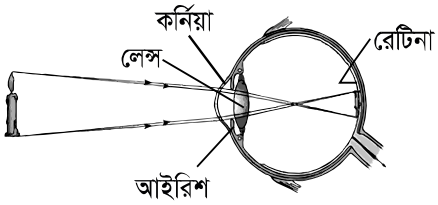

চিত্র: আমরা কীভাবে দেখি

যখনই আমাদের সামনে কোনো বস্তু থাকে, তখন ঐ বস্তু থেকে আলোকরশ্মি এই লেন্স দ্বারা প্রতিসরিত হয় এবং রেটিনার ওপর একটি উলটো প্রতিবিম্ব তৈরি করে। রেটিনার ওপর আলো পড়লে স্নায়ুর সাথে সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রড এবং কোণ কোষগুলো সেই আলো গ্রহণ করে তাকে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ সিগন্যালে পরিণত করে। স্নায়ু এই বিদ্যুৎ বা তড়িৎ সিগন্যালকে তাৎক্ষণিকভাবে অপটিক নার্ভ বা অক্ষি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পাঠায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কোণ কোষগুলো তীব্র আলোতে সাড়া দেয় এবং রঙের অনুভূতি ও রঙের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। অন্যদিকে রড কোষগুলো খুব কম আলোতে সংবেদনশীল হয়। এ জন্য জ্যোৎস্নার অল্প আলোতে আমরা "রড" কোষগুলোর কারণে দেখতে পাই ঠিকই কিন্তু কোনো রং বুঝতে পারি না। মস্তিষ্ক রেটিনায় সৃষ্ট উলটো প্রতিবিম্বকে সোজা করে নেয় বলে আমরা বস্তুটি যে রকম থাকে সেরকমই দেখি।

স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব

চোখের সবচেয়ে কাছে যে বিন্দু পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুকে খালি চোখে স্পষ্ট দেখা যায়, তাকে স্পষ্ট দৃষ্টির নিকট বিন্দু বলে এবং চোখ থেকে ঐ বিন্দুর দূরত্বকে স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব ধরে নেওয়া হয়। এই দূরত্ব মানুষের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। একজন শিশুর জন্য এই দূরত্ব ৫ সে.মি. এর কাছাকাছি এবং একজন স্বাভাবিক বয়স্ক লোকের জন্য এই দূরত্ব ২৫ সে.মি. পর্যন্ত হতে পারে। দূর বিন্দু চোখ থেকে অসীম দূরত্বে অবস্থান করে। এ কারণে আমরা বহুদূরের নক্ষত্রও খালি চোখে দেখতে পারি।

চোখের ত্রুটি এবং তার প্রতিকার

সুস্থ এবং স্বাভাবিক চোখ "নিকট বিন্দু" (Near point) থেকে শুরু করে অসীম দূরত্বের দূর বিন্দুর মাঝখানে যে স্থানেই কোনো বস্তু থাকুক না কেন সেটা স্পষ্ট দেখতে পারে। এটাই চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি। এই স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হলেই তাকে চোখের দৃষ্টির ত্রুটি বলা হয়।

দৃষ্টির অনেক ধরনের ত্রুটি থাকলেও আমরা প্রধান দুটি ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করব। সেই দুটি-

(ক) হ্রস্বদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি (Myopia or shortsightedness),

(খ) দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি (Hypermetropia or farsightedness)

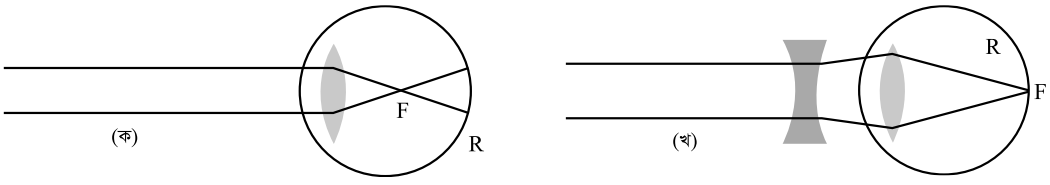

চিত্র: হ্রস্বদৃষ্টি ও তার প্রতিকার

হ্রস্বদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি (Myopia)

যখন চোখ কাছের বস্তু দেখতে পায় কিন্তু দূরের বস্তু দেখতে পায় না, তখন চোখের এই ত্রুটিকে হ্রস্বদৃষ্টি বলে। এরূপ চোখের দূর বিন্দুটি অসীম দূরত্ব অপেক্ষা খানিকটা নিকটে থাকে এবং বস্তুকে স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব হতে আরও কাছে আনলে অধিকতর স্পষ্ট দেখায়। এই সমস্যার ফলে দূরের বস্তু থেকে আসা আলোকরশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর রেটিনার উপরে প্রতিবিম্ব তৈরি না করে একটু সামনে (F) প্রতিবিম্ব তৈরি করে (চিত্র)। ফলে চোখ বস্তুটি স্পষ্ট দেখতে পায় না।

প্রতিকার: এই ত্রুটি দূর করার জন্য এমন একটি অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে।

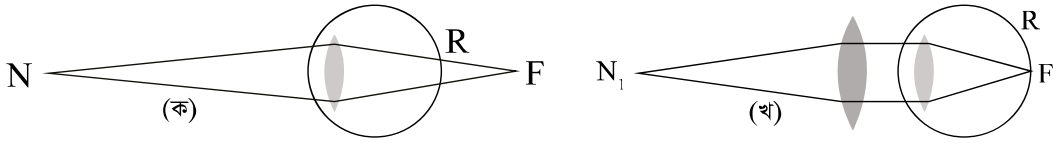

চিত্র: দীর্ঘদৃষ্টি ও তার প্রতিকার

দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি (Hypermetropia)

যখন কোনো চোখ দূরের বস্তু দেখে কিন্তু কাছের বস্তু দেখতে পায় না, তখন এই ত্রুটিকে দীর্ঘদৃষ্টি বলে। সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে এই ত্রুটি দেখা যায়।

এর ফলে দূর থেকে আসা আলো সঠিকভাবে চোখের রেটিনাতে প্রতিবিম্ব তৈরি করলেও কাছাকাছি বিন্দু থেকে আসা আলোকরশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর রেটিনার ঠিক উপরে না হয়ে পিছনে (F) বিন্দুতে মিলিত হয় (চিত্র)। ফলে চোখ কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় না।

প্রতিকার: এই ত্রুটি দূর করার জন্য একটি উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে।

বর্ণান্ধতা (Color Blindness)

[প্রশ্ন: বর্ণান্ধতা কী? ব্যাখ্যা করুন। (৪৩তম)]

আমাদের চোখের রেটিনায় তিন রকমের স্নায়ুগুচ্ছ বিদ্যমান, যেগুলো তিনটি মৌলিক বর্ণের আলোর উত্তেজনায় সাড়া দেয় এবং তিনটি মৌলিক বর্ণ সম্পর্কে অনুভূতি সৃষ্টি করে। এক বা একাধিক স্নায়ুর অনুপস্থিতি বা যথাযথ সক্রিয়তার অভাব মানুষকে বিশেষ বিশেষ রং সম্পর্কে অনুভূতিহীন করে তোলে। একে বর্ণান্ধতা বলে। বর্ণান্ধ ব্যক্তিরা বর্ণের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে না। বর্ণান্ধতা একটি চোখের জন্মগত সমস্যা। সকলের এ সমস্যা থাকে না।

Dispersion of Light

আলোর বিচ্ছুরণ

[প্রশ্ন: আলোর বিচ্ছুরণ কী? বর্ণালি সম্বন্ধে আলোকপাত করুন। (৩৮তম)]

হীরা, মূল্যবান রত্ন, স্ফটিক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আলো প্রবেশ করলে তা বিভিন্ন উজ্জ্বল বর্ণের সৃষ্টি করে, এই অভিজ্ঞতা মানুষের প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। বিভিন্ন উজ্জ্বল বর্ণ সৃষ্টির ক্ষমতার ওপর নির্ভর করেই রত্নরাজির মূল্য কম বা বেশি হতো। কিন্তু সাধারণ আলো প্রবেশে কেন উজ্জ্বল বর্ণের আলো সৃষ্টি হয় তার ব্যাখ্যা কারো জানা ছিল না। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন পরীক্ষার সাহায্যে প্রথম প্রমাণ করেন যে, সাদা আলোর প্রকৃতি যৌগিক।

কাচের মতো বিচ্ছুরক মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণের আলোক রশ্মির গতিবেগ বিভিন্ন। লাল আলোর গতিবেগ সর্বাপেক্ষা বেশি এবং বেগুনি বর্ণের সর্বাপেক্ষা কম। বিভিন্ন গতিবেগের ফলে প্রিজমের বেধ অতিক্রম করতে লাল, নীল প্রভৃতি আলোকরশ্মি বিভিন্ন সময় নেয় এবং পরস্পর হতে পৃথক হয়ে পড়ে। শূন্য মাধ্যমে অথবা বায়ুতে বিভিন্ন বর্ণের আলোকরশ্মির গতিবেগ সমান বলে শূন্য মাধ্যম অথবা বায়ু মাধ্যম দিয়ে যাবার সময় সাদা আলোর কোনো বিচ্ছুরণ হয় না। সাদা রঙের আলোর এই সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়াকে বিচ্ছুরণ বলে। প্রিজম হতে নির্গত রশ্মিকে পর্দার ওপর ফেললে সাতটি রঙের এক মনোরম পট্টি (Band) দেখা যায়। এই রঙিন পট্টির নাম বর্ণালি (Spectrum)।

সংজ্ঞা: সাদা আলোকরশ্মি প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের ফলে সাতটি মূল বর্ণের আলোকে বিভক্ত হওয়াকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোনো যৌগিক আলোক রশ্মির বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হওয়াকে বিচ্ছুরণ বলে। বিচ্ছুরণের ফলে মূল বর্ণসমূহের যে সজ্জা পাওয়া যায় তাকে বর্ণালি বলে।

বিচ্ছুরক মাধ্যম

[প্রশ্ন: সাদা আলোক বিশ্লিষ্ট করলে কয়টি বর্ণ পাওয়া যায়? বর্ণগুলো কী কী? (৩৫তম)]

যে মাধ্যম এ ধরনের বিচ্ছুরণ ঘটায় তাকে বিচ্ছুরক মাধ্যম (Dispersive medium) বলে। সাদা আলোক বিশ্লিষ্ট হলে যে সাতটি বর্ণ পাওয়া যায় এদের প্রত্যেকটির একটিমাত্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকে, তাই প্রত্যেকটিকে একবর্ণী আলোক বলে। অর্থাৎ যে আলোক রশ্মির একটিমাত্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকে তাকে একবর্ণী আলো (Monochromatic light) বলে।

সাদা আলোক বিশ্লিষ্ট হলে যে সাতটি বর্ণ পাওয়া যায় ওই বর্ণগুলো যথাক্রমে বেগুনি (Violet), নীল (Indigo), আসমানি (Blue), সবুজ (Green), হলুদ (Yellow), কমলা (Orange) এবং লাল (Red)। এই বর্ণগুলোর এক প্রান্তে থাকে লাল এবং অপর প্রান্তে থাকে বেগুনি। লাল এবং বেগুনি বর্ণের মধ্যে থাকে বাকি পাঁচটি বর্ণ। বর্ণালির বর্ণ সজ্জাকে সহজে মনে রাখার জন্য বর্ণগুলোর নামের বাংলা প্রথম অক্ষর নিয়ে বেনীআসহকলা পদ গঠন করা হয়েছে। ইংরেজিতে অনুরূপ পদ 'VIBGYOR'।

এই সাতটি বর্ণকে বিশুদ্ধ বর্ণ বলা হয়। বর্ণালির সাতটি বর্ণের তিনটি বিশেষ বর্ণকে উপযুক্ত পরিমাণে মিশিয়ে অন্য সব বর্ণই সৃষ্টি করা সম্ভব। এই বর্ণ তিনটি হলো লাল, সবুজ ও নীল। এদেরকে প্রাথমিক বর্ণ বলে। রেটিনার কোণ (cone) কোষগুলোয় তিন ধরনের আলো রিসেপ্টর থাকে। এরা লাল, নীল ও সবুজ বর্ণের আলোর তরঙ্গ সরাসরি অনুভব করতে পারে। তাই এ তিনটি রং কে মৌলিক বর্ণ অথবা প্রাথমিক বর্ণ বলা হয়।

যেমন- লাল ও সবুজ বর্ণের মিশ্রণে হলুদ বর্ণ পাওয়া যায়। আবার সবুজ, নীল ও লাল বর্ণের মিশ্রণে সাদা বর্ণ সৃষ্টি হয়। সাদা বর্ণ সৃষ্টির জন্য তিনটি বর্ণের মিশ্রণ জরুরি নয়; দুটি বর্ণ মিশিয়েও সাদা বর্ণ তৈরি করা যায়। যে দুটি বর্ণের মিশ্রণে সাদা বর্ণ তৈরি করা হয়, তাদেরকে পরিপূরক (Complementary) বর্ণ বলে। যেমন- হলুদ ও নীল বা সবুজ ও ম্যাজেন্টা মিশিয়ে সাদা বর্ণ সৃষ্টি হয়। সুতরাং হলুদ ও নীল বা সবুজ ও ম্যাজেন্টা পরিপূরক বর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ- সাদা কাপড় ধোয়ার পর কিছুটা হলদেটে দেখায়। নীল ও হলুদ যেহেতু পরিপূরক বর্ণ, তাই কাপড়ে নীল দিলে জামাকাপড় সাদা হয়।

মৌলিক বর্ণগুলো মিশিয়ে বিভিন্ন বর্ণ তৈরি করা যায়। যেমন:

মৌলিক বর্ণ	পরিপূরক বর্ণ	
লাল সবুজ আসমানি	লাল + আসমানি = বেগুনি লাল + হলুদ = কমলা আসমানি + হলুদ = সবুজ	সবুজ + লাল = হলুদ সবুজ + আসমানি = ময়ূরকণ্ঠী নীল লাল + আসমানি + সবুজ = সাদা

জানার বিষয়

১. কাচের মধ্যে লাল আলোর বেগ বেগুনি বর্ণের আলোর বেগের চেয়ে ১.৮ গুণ বেশি।

২. যেকোনো মাধ্যমে আলোর বেগ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক $\boxed{c \propto \lambda}$

৩. শূন্যস্থানে আলোর বিচ্ছুরণ হয় না কারণ সব বর্ণের আলো শূন্য স্থানে একই বেগে চলে।

আলোর বিচ্ছুরণ প্রদর্শন

১. মনে করি, অস্বচ্ছ পর্দায় A একটি সরু ছিদ্র, P একটি কাচ প্রিজম এবং প্রিজমের অপর পার্শ্বে কিছু দূরে অবস্থিত S একটি পর্দা (চিত্র)। সরু ছিদ্র দিয়ে সাদা আলোক রশ্মি প্রিজমে আপতিত হলে প্রতিসরিত রশ্মিটি সাতটি মূল বর্ণে বিভক্ত হবে এবং পর্দার ওপরে একটি রঙিন পট্টি পাওয়া যাবে। এই পট্টির এক প্রান্তে থাকে লাল বর্ণ এবং অপর প্রান্তে থাকে বেগুনি বর্ণ। বিভিন্ন বর্ণের সাপেক্ষে প্রিজমের উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক বিভিন্ন বলে এই বর্ণালির সৃষ্টি হয়।

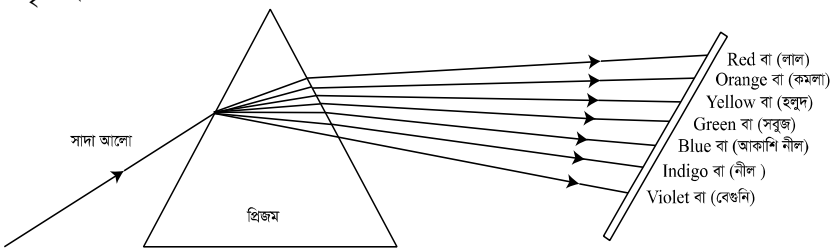

চিত্র: আলোর বিচ্ছুরণ

দেখা যাবে লাল বর্ণের আলোক রশ্মির বিচ্যুতি সর্বাপেক্ষা কম এবং বেগুনি বর্ণের আলোক রশ্মির বিচ্যুতি সর্বাপেক্ষা বেশি। আবার পর্দায় বেগুনি বর্ণের আলোক সর্বাপেক্ষা বেশি এবং লাল বর্ণের আলোক সর্বাপেক্ষা কম স্থান দখল করে থাকে। হলুদ বর্ণের আলোক রশ্মির বিচ্যুতি লাল ও বেগুনি বর্ণের আলোক রশ্মির বিচ্যুতির মাঝামাঝি। এজন্য এর বিচ্যুতিকে গড় বিচ্যুতি (Mean deviation) এবং হলুদ বর্ণের রশ্মিকে মধ্য রশ্মি (Mean ray) বলা হয়।

২. মুখে পানি নিয়ে সূর্যকে পিছনে রেখে মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে পানি ছিটিয়ে দিলে পানি বিন্দুর মধ্য দিয়ে সূর্য রশ্মির প্রতিসরণের ফলে সাতটি বর্ণবিশিষ্ট একটি ধনুকাকৃতির বর্ণালি দেখা যাবে।

৩. সূর্যের আলোক রশ্মি মেঘের গোলাকৃতি পানি বিন্দুর ওপর আপতিত হওয়ার পর প্রতিসরণের ফলে আকাশের গায়ে রংধনু বা রামধনু (Rainbow) সৃষ্টি করে। আকাশের যে দিকে সূর্য তার বিপরীতে সাধারণত এই বর্ণালি দেখা যায়।

আকাশ নীল দেখার কারণ: সূর্যের আলো বিকিরণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে বিদ্যমান ওজোনস্তরের গাঢ় নীল রঙের ওপর উক্ত আলো আপতিত হলে নীল রঙ বেশি বিক্ষিপ্ত হয়, এজন্য আমরা ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশ নীল দেখি।

সড়কে বিপদ সংকেতে সবসময় লাল আলো ব্যবহার করার কারণ [প্রশ্ন: বিপদ সংকেতে লাল রঙ ব্যবহার করা হয় কেন? (৪৪, ৩৫তম)]

লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। আর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় লাল আলো সবচেয়ে কম বিক্ষিপ্ত হয়। ফলে অন্যান্য রঙের আলোর চেয়ে লাল আলো স্থিরভাবে অবলোকন করা যায় এবং দূর থেকে সহজে দৃষ্টিগোচর হয়। এই দূর থেকে স্পষ্ট দেখার সুবিধার জন্য সড়কে বিপদসংকেত হিসেবে সবসময় লাল আলো ব্যবহার করা হয়।

আলোর ব্যতিচার (Distortion of Light)

দুটি আলোক উৎস থেকে একই বিস্তারের এবং একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো নির্গত হয়ে আলোক তরঙ্গ দুটির উপরিপাতনের ফলে কোনো বিন্দুর আলোক তীব্রতা বৃদ্ধি পায় আবার কোনো বিন্দুর তীব্রতা হ্রাস পায়। এর ফলে কোনো তলে পর্যায়ক্রমে আলোকোজ্জল ও অন্ধকার অবস্থার সৃষ্টি করে কোনো স্থানে বিন্দু থেকে বিন্দুতে আলোর তীব্রতার এ পর্যায়ক্রমিক তারতম্যকে আলোর ব্যতিচার বলে।

ব্যতিচার দুই প্রকার। যথা- গঠনমূলক ব্যতিচার ও ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার।

১। গঠনমূলক ব্যতিচার (Constructive Interference): দুটি সুসঙ্গত উৎস (প্রায় সমান বিস্তার ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট) থেকে নিঃসৃত কিন্তু একই তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং সমান বা প্রায় সমান বিস্তারবিশিষ্ট দুটি আলোক তরঙ্গের উপরিপাতনে ফলে কোনো বিন্দুর ঔজ্জ্বল্য বেড়ে গেলে অর্থাৎ আলোক তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে তাকে গঠনমূলক ব্যতিচার বলে।

২। ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার (Destructive Interference): দুটি সুসঙ্গত উৎসথেকে নিঃসৃত কিন্তু একই তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং সমান বা প্রায় সমান বিস্তারবিশিষ্ট দুটি আলোক তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে কোনো বিন্দু অন্ধাক বা প্রায় অন্ধকার হয়ে গেলে তাকে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার বলে।

ব্যতিচারের শর্ত

১. উৎস দুটি সুসঙ্গত হতে হবে।	৩. তরঙ্গ দুটির বিস্তার সমান হতে হবে।
২. একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক উৎস হতে হবে।	৪. তরঙ্গ উৎস দুটি খুব কাছাকাছি হতে হবে।

আলোর বিক্ষেপণ (Diffraction of Light)

যখন কোনো আলোক তরঙ্গ কোনো ক্ষুদ্র কণিকার উপর পড়ে তখন কণিকাগুলো আলোক তরঙ্গকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। একে বলা হয় আলোর বিক্ষেপণ। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হবে তার বিক্ষেপণ তত বেশি হবে।

আলোর বিক্ষেপণের কিছু উদাহরণ- [প্রশ্ন: সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য লাল দেখায় কেন? (৪০, ৩৫তম)]

১. সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য লাল দেখায় আলোর বিক্ষেপণের জন্য। এ সময় সূর্য দিগন্তরেখার খুব কাছাকাছি কাছাকাছি অবস্থান করে, ফলে আলো আমাদের চোখে পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় ধরে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বায়ুমণ্ডলে থাকা ধূলিকণা, পানিকণা ইত্যাদি কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (যেমন: বেগুনি, নীল, আসমানি) রঙগুলোকে বেশি পরিমাণে বিচ্ছুরিত করে দেয়। কিন্তু বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লাল রঙের আলো কম বিক্ষেপিত হয় এবং অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তাই শেষ পর্যন্ত লাল আলোই বেশি পরিমাণে আমাদের চোখে আসে এবং সূর্য লাল দেখায় ।

২. নীল আলোর বিক্ষেপণ অপেক্ষাকৃত বেশি বলে সমুদ্র নীল দেখায়।

৩. দিনের বেলা আকাশ কর্তৃক বিক্ষিপ্ত হালকা নীল আলো চাঁদের নিজস্ব হলুদ রঙের সাথে মিশে যায়। এই দুটি বর্ণের মিশ্রণের ফলে চোখে চাঁদকে সাদা বলে মনে হয়। কিন্তু সূর্যাস্তের পর আকাশের হালকা নীল বর্ণ লোপ পায় বলে চাঁদকে হলুদ দেখায়।

৪. একজন নভোচারী আকাশের রং কালো দেখতে পায়, কারণ মহাকাশে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই।

Particle Nature of Light & Einstein's Photo Electric Equation

ধাতব পদার্থের ওপর যথোপযুক্ত কম্পাঙ্কের দৃশ্যমান আলোক কিংবা অন্য কোনো বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ আপতিত হলে ওই পদার্থ হতে ইলেকট্রন নির্গত হয়। আলোক রশ্মি যতক্ষণ পর্যন্ত ধাতব পদার্থে আপতিত হয়, ততক্ষণই ইলেকট্রন নির্গত হয়। ধাতব পদার্থ হতে নির্গত ইলেকট্রনকে বলা হয় ফটো-ইলেকট্রন (Photo-Electron) বা আলোক ইলেকট্রন। আলোকের প্রভাবে ধাতব পদার্থ হতে ইলেকট্রনের নির্গমনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় আলোক তড়িৎ নির্গমন (Photo-Electric Emission) এবং এই ক্রিয়াকে বলা হয় ফটো-ইলেকট্রিক ক্রিয়া বা আলোক তড়িৎ ক্রিয়া (Photo-Electric Effect)। নির্গত ইলেকট্রন প্রবাহিত হওয়ার ফলে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় আলোক তড়িৎ (Photo-Electricity) এবং যে বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় ফটো-ইলেকট্রিক প্রবাহ বা আলোক তড়িৎ প্রবাহ (Photo-Electric Current)। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, সিজিয়াম, লিথিয়াম, রুবিডিয়াম প্রভৃতি ক্ষারধর্মী পদার্থের উপর দৃশ্যমান আলোক আপতিত হলে অধিক পরিমাণে ফটো ইলেকট্রন নির্গত হয়। অর্থাৎ ক্ষারধর্মী পদার্থের আলোক তড়িৎ সংবেদনশীলতা বেশি। তবে এক্স-রশ্মি বা গামা-রশ্মির প্রভাবে সব ধাতব পদার্থে আলোক তড়িৎ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেয়া যায়।

আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার সূত্র

১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে লিনার্ড, থমসন, রিচার্ডসন এবং কম্পটন-এর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল হতে নির্ণীত হয়েছে যে আলোক তড়িৎ নির্গমন নিম্নলিখিত সূত্র মেনে চলে।

১ম সূত্র: আপতিত রশ্মির পতনকাল এবং আলোক ইলেকট্রন-এর নির্গমনকালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যদি থাকে তবে তা অবশ্যই 3×10^{-9} সেকেন্ডের কম।

২য় সূত্র: প্রতিটি আলোক ইলেকট্রন নির্গমনের ক্ষেত্রে আপতিত আলোক রশ্মির একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম কম্পাঙ্ক রয়েছে যার নাম প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক।

৩য় সূত্র: আপতিত আলোকের কম্পাঙ্ক প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক অপেক্ষা অধিক হলে আলোক তড়িৎ প্রবাহমাত্রা আপতিত আলোকের প্রাবল্যের সমানুপাতিক অর্থাৎ, $\boxed{i \propto I}$

এখানে i = তড়িৎ প্রবাহমাত্রা এবং I = আলোকের প্রাবল্য।

৪র্থ সূত্র: আলোক ইলেকট্রনের গতিবেগ তথা গতিশক্তি আপতিত আলোকের প্রাবল্যের ওপর নির্ভর করে না, বরং আপতিত আলোকের কম্পাঙ্ক এবং নিঃসারক বা নির্গমক (emitter)-এর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।

আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন আলোক তড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্য প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। যদি f ফোটনের কম্পাঙ্ক হয়, তবে প্রতিটি ফোটনের শক্তি হবে $\boxed{E = hf}$, এখানে h হলো প্লাঙ্কের ধ্রুবক। এখন মনে করি, hf শক্তিবিশিষ্ট একটি ফোটন কোনো একটি ধাতব পাতের পরমাণুর ওপর আপতিত হলো (চিত্র ১.১৪)। এই সংঘাতের ফলে পরমাণুস্থ একটি ইলেকট্রন ফোটনের সমুদয় শক্তি গ্রহণ করবে এবং কোনো শক্তি স্থানান্তরিত হবে না। এখন ইলেকট্রনটি নিউক্লিয়াসের সঙ্গে আবদ্ধ থাকায় এই শক্তির কিছু অংশ (W) ইলেকট্রনকে নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ হতে মুক্ত করতে ব্যয় হবে। অবশিষ্ট শক্তি নিয়ে ইলেকট্রন প্রচণ্ড বেগে নির্গত হবে। যদি ইলেকট্রনের ভর m হয়,

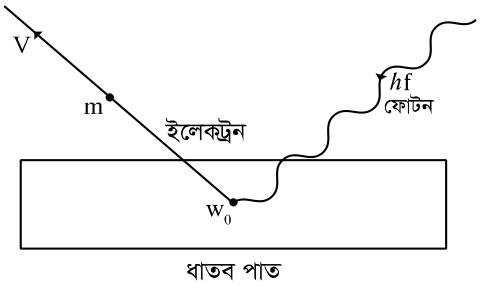

চিত্র: আলোক তড়িৎ ক্রিয়া

তবে এর গতিশক্তি = $\frac{1}{2}mV^2$

অতএব, শক্তির নিত্যতা সূত্র হতে পাই,

$$E = \frac{1}{2}mV^2 + W$$

$$hf = \frac{1}{2}mV^2 + W \quad [\because E = hf]$$

বা, $\frac{1}{2}mV^2 = hf - W$ ..... (১)

এখানে W = ইলেকট্রনকে নিউক্লিয়াসের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে ব্যয়িত শক্তি। যখন বন্ধন শক্তি ন্যূনতম হবে, তখন নির্গত ইলেকট্রনের গতিশক্তি বা বেগ সর্বোচ্চ মানের হবে। এই ন্যূনতম বন্ধন শক্তি W_0 এবং নির্গত ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ বেগ V_m হলে, সমীকরণ (১)-কে লেখা যায়।

$$\frac{1}{2}mV_m^2 = hf - W_0 \quad \text{..... (২)}$$

ন্যূনতম বন্ধন শক্তি W_0 কে বলা হয় কার্য অপেক্ষক (Work function) W_0 বিভিন্ন পদার্থের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানের হয়। সমীকরণ (১) ও (২) হলো আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ। ওপরের সমীকরণে, $V_m = 0$ হলে, $hf = W_0$।

Photocells

ফটোসেল

ফটোসেল (Photocells) হলো এক ধরনের শক্তির রূপান্তরক, যা বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকশক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এটি মূলত একটি পরিবর্তনশীল রোধ। আপতিত আলোর পরিমাণের ওপর এই পরিবর্তনশীল রোধের মান নির্ভর করে।

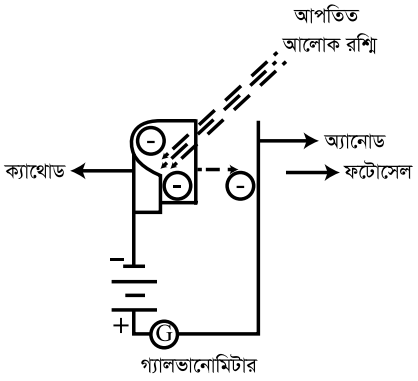

চিত্র: ফটোসেলের গঠন

গঠন: ফটোসেল হচ্ছে একটি বায়ুশূন্য কাচের বাক্স, যার মধ্যে একটি অ্যানোড এবং সিজিয়াম ধাতুর তৈরি ক্যাথোড থাকে। ক্যাথোডের উপাদানগুলো আপতিত আলোর একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে সাড়া দেয়। আপতিত আলোর পরিমাণ বেশি হলে তড়িৎপ্রবাহের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়।

ব্যবহার

১. রাস্তায় চলাচলকারী যানবাহন গণনা করতে ব্যবহৃত হয়।
২. বিমানবন্দরের কনভেয়ার বেল্টে চলমান মালপত্র গণনা করতে ব্যবহৃত হয়।
৩. চুরি প্রতিরোধক অ্যালার্ম পরিচালনা করতে ব্যবহৃত হয়।
৪. চলচ্চিত্রে শব্দ প্রক্ষেপণে ব্যবহৃত হয়।
৫. বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক ভবনের দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলতে ব্যবহৃত হয়।

সূর্যরশ্মি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের দুইটি পদ্ধতি হলো: - [প্রশ্ন: সূর্যরশ্মি হতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে দুইটি পদ্ধতির বর্ণনা দিন। (৩৭তম)]

১. সৌর তাপবিদ্যুৎ ব্যবস্থার মাধ্যমে (Solar Thermal Technology)

সৌর তাপবিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রধান অংশ হচ্ছে প্রতিফলক যন্ত্র যা মূলত একটি সোলার কালেক্টর। এটি দেখতে অনেকটা অবতল দর্পণের মতো, যা সূর্যের আলোকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে একীভূত করতে পারে। সোলার কালেক্টরের সাহায্যে সংগ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে থাকা থার্মিনল তেলকে উত্তপ্ত করা হয় ও বাষ্প উৎপন্ন করা হয়। বাষ্পের গতিশক্তিকে টারবাইনের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করা হয়। এরপর জেনারেটরের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

২. সৌরকোষের মাধ্যমে (Photovoltaic Solar Technology)

সৌরকোষের মাধ্যমে সূর্যের আলো থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

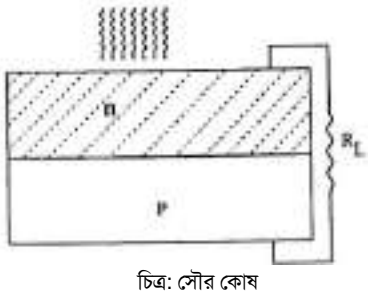

চিত্র: সৌর কোষ

নিচে একটি সৌরকোষের গঠন বর্ণনা করা হলো:
একটি p টাইপ অর্ধপরিবাহীর উপর একটি n-টাইপ অর্ধ পরিবাহী তৈরি করা হয় ফলে একটি p-n জাংশন সৃষ্টি হয়। n টাইপ অর্ধপরিবাহী ও p টাইপ অর্ধপরিবাহীতে ধাতব সংযোগের মাধ্যমে লোড যুক্ত করা হয়। n টাইপ অর্ধ পরিবাহী স্তরটি অত্যন্ত পাতলা বা চিকন করে তৈরি করা হয়।

ক্রিয়া: যখন আলোক রশ্মি এসে n টাইপ অর্ধপরিবাহীর উপর আপতিত হয় তখন তা n টাইপ অর্ধ পরিবাহীর স্তরকে ভেদ করে p ও n টাইপ অর্ধপরিবাহীর সংযোগ স্থলে পৌঁছে এবং সেখানে ইলেকট্রন হোল সৃষ্টি করে। উৎপন্ন ইলেকট্রন লোডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে।

ব্যবহার [প্রশ্ন: সৌরশক্তির বর্তমান ব্যবহার এবং এর সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। (৩৮তম)]

১. বিদ্যুৎ উৎপাদন করে লাইট, ফ্যান, মটর, সেচ পাম্প প্রভৃতি চালানো যাচ্ছে।
২. ক্যালকুলেটর, পকেট রেডিও, ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি চালানো হচ্ছে।
৩. কৃত্রিম উপগ্রহে তড়িৎশক্তি সরবরাহ করা হয় সৌরকোষ দিয়ে। আর সৌরকোষ শক্তি সঞ্চয় করে সূর্যতাপ হতে।
৪. সৌরশক্তি ব্যবহার করে পরীক্ষামূলক বিমান চালানো শুরু হয়েছে।

সৌরশক্তি একটি নবায়নযোগ্য, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই শক্তি উৎস, যা ভবিষ্যতে জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এটি কার্বনমুক্ত, সহজলভ্য এবং প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে আরও কার্যকর ও সাশ্রয়ী হয়ে উঠছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রচুর সূর্যালোক পাওয়ায় সৌরশক্তির ব্যবহার গ্রামীণ বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

Miscellaneous

সূর্য ও চন্দ্রের আকারের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও আমাদের চোখে উভয়কেই প্রায় সমান মনে হওয়ার কারণ: চোখের রেটিনায় গঠিত প্রতিবিম্বের আকার নির্ভর করে বীক্ষণ কোণের ওপর। বীক্ষণ কোণ বাড়লে বস্তুর আকার বাড়ে, আবার বীক্ষণ কোণ কমলে আকার ছোট হয়। এখন সূর্য ও চন্দ্র আমাদের চোখে প্রায় একই বীক্ষণ কোণ উৎপন্ন করে বিধায় এদেরকে প্রায় সমান বলে মনে হয়।

রঙিন টিভিতে আলোক রশ্মি ব্যবহার

রঙিন টিভিতে লাল, নীল, সবুজ রঙের আলোক রশ্মি ব্যবহার করা হয়। এ তিনটি রঙের সংমিশ্রণে অন্যান্য আলোর রং ফুটে ওঠে।

সৃষ্টির প্রক্রিয়া: টেলিভিশন ক্যামেরায় তিনটি ফিলটার আছে। এই তিনটি ফিলটার পৃথকভাবে লাল, নীল ও সবুজ আলোকে ভেদ করতে পারে। প্রতিটি রং একটি পৃথক ক্যামেরা টিউবে যায় এবং প্রতিটি টিউবে পৃথক ইলেকট্রন বিম রয়েছে। তিনটি টিউব থেকে তিনটি সংকেত প্রেরক যন্ত্রে যায়। রঙিন টেলিভিশনের প্রেরক যন্ত্র তিনটি সংকেতকে একই বহুরূপযুক্ত সংকেতে পরিণত করে।

এর সঙ্গে সাদা-কালো সংকেত যোগ করে অ্যানটেনায় পাঠান হয়। রঙিন টেলিভিশনের ইলেকট্রন বিম তিনটি রঙের জন্য কার্যকর। টেলিভিশনের পর্দায় একটি হালকা ফসফরের প্রলেপ থাকে। তিন রঙের জন্য ফসফর সাজানো থাকে। যখন কোনো ইলেকট্রন বিম বা বিদ্যুৎ পরমাণু রশ্মি ফসফরের উপর পতিত হয় তখন ফসফর আলো বা রশ্মি দান করে। প্রতিটি গ্রুপের বিন্দুর দ্বারা যে রং প্রকাশিত হয় তা ইলেকট্রন বীমের গভীরতার উপর নির্ভর করে। এভাবে তিনটি বীমের প্রভাবে তিন বর্ণের আলো ফুটে ওঠে।

সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্ব ও টিউব লাইটের আলোর মধ্যে উৎপত্তিগত পার্থক্য: সাধারণ বৈদ্যুতিক বা সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বে টাংস্টেনের সরু তার ব্যবহৃত হয়। তড়িৎপ্রবাহ টাংস্টেন তারের উচ্চ রোধের মধ্য দিয়ে চলার সময় টাংস্টেনের ফিলামেন্ট খুব উত্তপ্ত হয় এবং আলো বিকিরণ করে।

টিউব লাইট

টিউব লাইটে নিম্নচাপে গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎ ক্ষরণের ফলে এ বাতিতে আলো পাওয়া যায়। নলের এক প্রান্তে ধনাত্মক তড়িৎদ্বার এবং অপর প্রান্তে ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার থাকে। নলের ভেতরের বায়ুচাপ 5 mm পারদ স্তম্ভের সমান করে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করা হয়। এতে তড়িৎদ্বারের মধ্যকার জায়গা তরঙ্গায়িত উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়।

হলোগ্রাফি ও হলোগ্রাম

হলোগ্রাফি হলো লেন্সের ব্যবহার ব্যতিরেকে আলোকচিত্র তৈরির একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে গৃহীত আলোক প্রতিবিম্বকে বলা হয় হলোগ্রাম। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত ছবি ত্রিমাত্রিক। এটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। সাধারণত কম্পিউটারে তথ্য সঞ্চয় করে রাখা, বস্তুর গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণে হলোগ্রাফি ব্যবহৃত হয়।

মহাজাগতিক রশ্মি

মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Ray) হলো বাইরে থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন যে আহিত কণাসমূহ প্রবেশ করে তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে মহাজাগতিক রশ্মি বলা হয়।

ব্ল্যাক হোল (কৃষ্ণ গহ্বর) [প্রশ্ন: কৃষ্ণ গহ্বর কী? (৪৪তম)]

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গাণিতিক মডেলের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে একটি নক্ষত্রের মৃত্যু পূর্ব ভর সূর্যের ভর থেকে **৩ গুণ বেশি** হলে নক্ষত্রটির ভেতরে মহাকর্ষ বল সংকুচিত হয়ে এটি শূন্য ব্যাসার্ধ এবং অসীম ঘনত্বের বিন্দু বস্তুতে পরিণত হতে পারে। বস্তুটি বিন্দু হোক বা না হোক এর আকর্ষণ বল এত বৃদ্ধি পাবে যে এর আশেপাশে থেকে কোনো কিছুই এমনকি আলোও বেরিয়ে আসতে পারবে না। ঐ অঞ্চলকে কৃষ্ণ বিবর বা গহ্বর বা **Black hole** বলে। ১৯৬৯ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী **জন হুইলার** সর্বপ্রথম **Black Hole** বা কৃষ্ণগহ্বর শব্দটি ব্যবহার করেন। পৃথিবীর নিকটতম **Black hole** হলো আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা **Sagittarius A**।

নমুনা লিখিত প্রশ্ন

০১. আলোর ব্যতিচার কী? ব্যতিচার এর শর্ত কী কী?
০২. সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে সামান্য উপবৃত্তাকার দেখায়, এর কারণ কী?
০৩. পরিপূরক বর্ণ বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দিন।
০৪. আলোর বিক্ষেপণ কাকে বলে? বর্ণালিতে কোন আলোর বিক্ষেপণ সবচেয়ে বেশি?
০৫. আলোকের বিচ্ছুরণের দুটি উদাহরণ দিন।
০৬. সরল পেরিস্কোপ কী? এর ব্যবহার লিখুন।
০৭. কোনো মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করে? রংধনু বা রামধনু সৃষ্টির কারণ কী?
০৮. মোটর গাড়ির হেডলাইট বা রাস্তার লাইটে প্রতিফলক হিসাবে উত্তল দর্পণ ব্যবহার করা হয় কেন?
০৯. আলোক তড়িৎ ক্রিয়া বলতে কী বুঝেন?
১০. LASER কী? এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার আলোচনা করুন।
১১. ফটো তড়িৎ ক্রিয়া সংক্রান্ত আইনস্টাইনের সমীকরণটি লিখুন ও ব্যাখ্যা করুন।
১২. পানিতে থাকা মাছকে প্রকৃত অবস্থান থেকে কিছুটা উপরে দেখায় কেন?

১৩. কোনো লেন্সের ক্ষমতা -2D বলতে কী বোঝায়?
১৪. তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের নাম ও দুটি করে ব্যবহার লিখুন।
১৫. বর্ণালি কী? তাড়িতচৌম্বক বর্ণালির বর্ণনা দিন।
১৬. অবলোহিত রশ্মি ও বেতার তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
১৭. ফটোসেল কী? এর ব্যবহার লিখুন।
১৮. পানির সাপেক্ষে হীরকের ক্রান্তিকোণ ৩৩° বলতে কী বুঝায়?
১৯. ফোটন কী এবং এর বৈশিষ্ট্য কী?
২০. গামা রশ্মির প্রভাবে মানুষের কী কী ক্ষতি হতে পারে? বেতার তরঙ্গ সম্পর্কে লিখুন।
২১. লাল আলোতে গাছের পাতা কালো দেখায় কেন?
২২. প্রতিসরণাঙ্ক কী? কাচের প্রতিসরণাঙ্ক 1.5 বলতে কী বুঝায়?
২৩. পাহাড়ি রাস্তায় নিরাপদ ড্রাইভিং এর জন্য কোন ধরনের দর্পণ ব্যবহৃত হয় এবং কেন?
২৪. মায়োপিয়া বা হ্রস্বদৃষ্টি কী? এর কারণ, ত্রুটির ফল এবং প্রতিকার লিখুন।
২৫. সংকট কোণ বা ক্রান্তি কোণ কাকে বলে?

নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর

০১. অবলোহিত রশ্মি ও বেতার তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য কী? ২

উত্তর:

অবলোহিত রশ্মি	পার্থক্যের বিষয়	বেতার তরঙ্গ
700nm – 1mm	তরঙ্গদৈর্ঘ্য	কয়েক মিলিমিটার থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত।
বেশি	শক্তি	কম
গরম বস্তুর তাপ বিকিরণ	উৎস	অ্যান্টেনা বা ইলেকট্রনিক যন্ত্র
তুলনামূলক বেশি	কসমপাঙ্ক	কম
রিমোট কন্টোল, থার্মাল ক্যামেরা ইত্যাদি	ব্যবহার	রেডিও সম্প্রচার, মোবাইল, টেলিভিশন যোগাযোগ

০২. সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য লাল দেখায় কেন? ১.৫

উত্তর:

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য লাল দেখায় আলোর বিক্ষেপণের জন্য। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য দিগন্তরেখার খুব কাছাকাছি থাকে। এ সময় সূর্যের আলো পৃথিবীর দীর্ঘ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আমাদের চোখে পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় নেয়। এই সময়ে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণা, পানিকণা ইত্যাদির জন্য সূর্যরশ্মির কম তরঙ্গবিশিষ্ট বেগুনি, নীল, আসমানি প্রভৃতি বর্ণের বিক্ষেপণ সবচেয়ে বেশি হয় এবং সবচেয়ে বেশি তরঙ্গবিশিষ্ট লাল বর্ণের বিক্ষেপণ সবচেয়ে কম হয়। ফলে অন্যান্য রঙের চেয়ে লাল আলো দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আমাদের চোখে অবলোকিত হয়। এজন্য সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য লাল দেখায়।

০৩. আলোর বিচ্ছুরণ কী? বর্ণালি সম্বন্ধে আলোকপাত করুন। ২

উত্তর:

আলোর বিচ্ছুরণ: সাদা আলোকরশ্মি বা সূর্যের রশ্মি প্রিজমের মধ্যে দিয়ে প্রতিসরণের ফলে সাতটি মূল বর্ণের আলোকে বিশ্লিষ্ট হয়। সাদা রঙের আলোর এই সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়াকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে।

বর্ণালি: যৌগিক আলোক রশ্মি কোনো মাধ্যমে প্রতিসরণের ফলে মূল রঙগুলোর যে সাজানো সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় তাই বর্ণালি। সরু ছিদ্র দিয়ে সাদা আলোক রশ্মি প্রিজমে আপতিত হলে প্রতিসরিত রশ্মিটি সাতটি মূল বর্ণে বিভক্ত হয়ে সাত বর্ণের একটি পট্টি সৃষ্টি করে। এই পট্টির এক প্রান্তে থাকে লাল বর্ণ এবং অপর প্রান্তে থাকে বেগুনি বর্ণ। বিভিন্ন বর্ণের সাপেক্ষে প্রিজমের উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক বিভিন্ন বলে এই বর্ণালির সৃষ্টি হয়। লাল বর্ণের আলোক রশ্মির বিচ্যুতি সর্বাপেক্ষা কম এবং বেগুনি বর্ণের আলোক রশ্মির বিচ্যুতি সর্বাপেক্ষা বেশি। এজন্য লাল আলো সবচেয়ে কম এবং বেগুনি আলো সবচেয়ে বেশি বাঁকে।

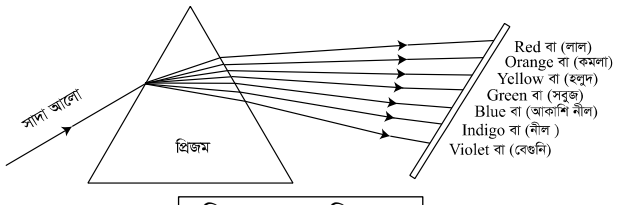

চিত্র: আলোর বিচ্ছুরণ

০৪. হীরক উজ্জ্বল দেখায় কেন? ১

উত্তর:

হীরকের প্রতিসরণাঙ্ক বেশি। বায়ুর সাপেক্ষে হীরকের ক্রান্তি কোণের মান 24°, অর্থাৎ আপতন কোণের মান 24° এর চেয়ে বেশি হলে আলোকরশ্মির প্রতিসরণ না হয়ে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে। হীরকে আলোকরশ্মি সামান্য কোণে আপতিত হলেই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে। বেশি সংখ্যক আলোকরশ্মি পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে হীরক উজ্জ্বল দেখায়।

০৫. মরীচিকা কী? মরুভূমির মরীচিকার কারণ ব্যাখ্যা করুন। বা, মরীচিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন। ২.৫

উত্তর:

মরীচিকা: মরীচিকা একটি আলোকীয় ঘটনা যা আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে সৃষ্টি হয়।

মরীচিকা সৃষ্টি: উত্তপ্ত মরুভূমিতে পথচারীর কাছে মনে হয় সামনে অল্প দূরত্বে পানি আছে, কিন্তু তিনি কখনোই পানির কাছে পৌঁছতে পারেন না, কেননা এটি মরীচিকা বা দৃষ্টিভ্রম। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে মরুভূমির বালি উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বালিসংলগ্ন বায়ুস্তরগুলোও গরম হয়ে ওঠে। নিচের বায়ু উত্তপ্ত ও হালকা হয়, তবে উপরের বায়ু নিচের বায়ুমণ্ডলের তুলনায় ঠান্ডা থাকায় ঘন থাকে।

এখন, গাছ থেকে যে আলো আসে তা ঘনতর মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করতে থাকে। এর ফলে প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এক সময় ঐ আলোক-রশ্মি কোনো একটি বায়ুস্তরে ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হয় ও আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে। এই প্রতিফলিত রশ্মি যখন মরুভূমির কোনো পথিকের চোখে পৌঁছায় তখন চোখ রশ্মির এই বাঁকা পথ অনুসরণ করতে পারে না, তার কাছে মনে হয় যেন রশ্মিটি q′ বিন্দু থেকে আসছে। ফলে পথিক ঐ গাছের উল্টানো প্রতিবিম্ব দেখতে পায়।

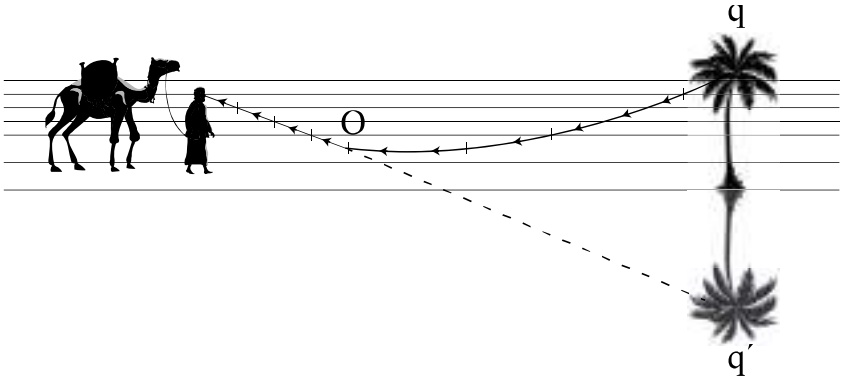

চিত্র: মরীচিকা সৃষ্টি

০৬. লেন্সের ক্ষমতা কাকে বলে? কোনো লেন্সের ক্ষমতা +2D বলতে কী বোঝায়? ২.৫

উত্তর:

লেন্সের ক্ষমতা: উত্তল লেন্স প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একগুচ্ছ আলোকরশ্মিকে প্রধান অক্ষের উপর একটি বিন্দুতে (প্রধান ফোকাস) মিলিত বা অভিসারী করে। অন্যদিকে অবতল লেন্স এরূপ আলোকরশ্মিকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় বা অপসারী করে। লেন্সের ক্ষমতা বলতে এই অভিসারী বা অপসারী প্রবণতাকেই বোঝায়।

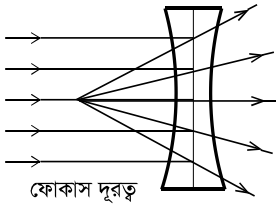

চিত্র: অবতল লেন্সের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সমান্তরাল রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে।

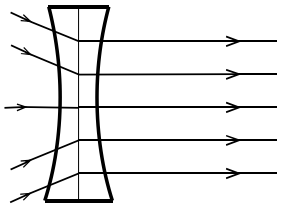

চিত্র: অবতল লেন্সের ভেতর দিয়ে যাবার সময় অভিসারী রশ্মি সমান্তরাল হয়ে যাবে।

কোনো লেন্সের ক্ষমতা + 2D বলতে বোঝায় এটি একটি উত্তল লেন্স এবং এটি প্রধান অক্ষোর সমান্তরাল একগুচ্ছ আলোকরশ্মিকে লেন্সের আলোক কেন্দ্রে হতে $\frac{1}{2}$m বা 0.5 m দূরে এক বিন্দুতে মিলিত করে।

০৭. অতিবেগুনি রশ্মির উপকারী ও অপকারী দিক আলোচনা করুন। ২

উত্তর:

অতিবেগুনি রশ্মি (Ultraviolet, UV): অতিবেগুনি রশ্মি এক ধরনের তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ। 10^{-9}m থেকে 3.5×10^{-7}m তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণকে অতিবেগুনি রশ্মি বলে। সূর্য রশ্মিতে UV থাকে।

উপকারী দিক	অপকারী দিক
১. ফটোইলেকট্রিক প্রভাব বিশ্লেষণে এটি ব্যবহৃত হয়। ২. মানবদেহে ভিটামিন 'ডি' উৎপাদন করে। ৩. জীবাণুমুক্তকরণে ব্যবহার করা হয়। ৪. রং, বীজ, ঔষধ প্রভৃতির বিশুদ্ধতা যাচাই করতে ব্যবহৃত হয়। ৫. খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।	১. মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ২. চর্ম ক্যান্সার হতে পারে। ৩. চোখে ছানি পড়া ও অন্ধত্বের হার বেড়ে যায়। ৪. বীজের উৎকর্ষ নষ্ট হয়। ৫. ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।